আকাশের নীচে মানুষ

রবীন চক্রবর্তী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ ১৩৭১ সন

প্রকাশক

শ্রীসুনীল মণ্ডল

৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট

শ্রীগণেশ বসু

হাওড়া

ব্লক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

মুদ্রক

কৃষ্ণা রায়

তারা মুদ্রণ

২৫০/এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬।

শেষ রাত্রে প্রচণ্ড বোমাবাজী শুরু হলো। ও পাড়ার দেঁতো কাশীর দল এ্যাটাক করেছে। চিৎকার চেঁচামেচি। টালির ছাদ ফুটো হয়ে ভেতরে অগ্নিকাণ্ড। শিশু ডুকরে ওঠে কোনো ঘরে। গায়ে লাগল কিনা কে জানে। এমন ঘটনা নতুন না হলেও, বস্তিবাসীদের অনেকের কাছে ভীতিপ্রদ। এ-পাড়ার ছেলেরাও কতবার ও-পাড়ায় গিয়ে চড়াও হয়। আজ ওরা মওকা পেয়েছে। খবর নিয়ে নিশ্চয় জেনেছে, এরা অপ্রস্তুত। তবু এ-পাড়ার দল সাধ্যমতো লড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা চলে গেল। মালমশলা ফুরিয়ে গিয়েছিল বোধহয়। চারদিকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নীরবতা ফিরে না এলেও চেঁচামেচি স্তিমিত হয়ে আসে।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করে একটু একটু করে। পাড়ার দলের মধ্যে নীচু গলায় কথাবার্তা। তাদের মা-বাবারা এতক্ষণ পরে একজন একজন করে বার হয়ে আসে ঘর থেকে।

নানান কণ্ঠে আকুল ডাক—ও শিবু—ও সুখেন—মানিক। ও হারু নিউটনরে—তোদের চোট লাগে নি তো? ও ঘোত্না—

একজন চেঁচিয়ে ওঠে—ন্যাটা-হাবুর লাশ পড়েছে।

বস্তিবাসী একজন মহিলা বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে—এ্যাঁ। ও আমার হাবুরে—তুই এ কি করলি রে।

ন্যাটা-হাবুর লাশ পড়েছিল একটা লাইট পোস্টের নীচে। রক্তাক্ত—চেনা যায় না। হাবুর মা উন্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়ে সেখানে আছাড় খেয়ে পড়ে। তারপর মানসিক আঘাত এবং খাদ্যাভাবের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তবে জ্ঞান হারাবার আগে হাবুর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা ঘিলু নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল।

ওপারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ থেকে দক্ষিণের মৃদুমন্দ সমীরণ বইতে থাকে। লাশকে ঘিরে একদল বস্তিবাসী। তাদের এতদিনের নায়কের আজ

পতন হয়েছে। সে আর নেই।

যে কয়টি তরুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যাদের কেউ কেউ এখনো হাতে পাইপ-গান আর পেটো ধরে রয়েছে, তাদের সবার দলপতি ছিল এই পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক ন্যাটা-হাবু—যে তাদের কখনো পেছু হটে আসা শেখায় নি।

বৃদ্ধদের একজন খেঁকিয়ে ওঠে—এখনো ওগুলো নিয়ে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন হাঁদারাম। ওই বড় বাড়িগুলো থেকে পুলিশে ফোন চলে গিয়েছে এতক্ষণ—জানিস না? পালা—

ছেলেদের মধ্যে সাড়া জাগে। তারা সরে পড়তে থাকে। শিবু যাবার আগে বলে—হাবুদাকে কতবার বলেছি, বাইরে শুবি না। শুনলো না কিছুতে। ওদের চর আছে এ-পাড়ায়।

কথাটা বলেই সে উপস্থিত সবার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টি ফেলে। সে দেখতে চায় কারও চোখের পাতা পিট্‌পিট্‌ করে কিনা।

যাবার আগে বলে যায়—ঠিক আছে। পরে ব্যবস্থা হবে। চেপে থাকতে পারবে না কোনো শালা। যদি এক বাপের ছেলে হই তো খুঁজে বার করবই।

সবাই মুহূর্তে জেনে গেল, হাবুর পরে এবারে, শিবু হলো নেতা। ন্যাটা-হাবুর দল এবার থেকে শিবু চালাবে। এখানে নেতা হতে হলে ভোটে দাঁড়াতে হয় না। স্বভাব-নেতা এরা। এমনিতেই বোঝা যায় কার পরে কে ভার নেবে। শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে যায়। গরম বাতাস ওপরে উঠে গেলে ঠাণ্ডা বাতাস মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এসে সেই স্থান যেমন ভরাট করে দেয়—তেমনি। ক্বচিৎ কখনো যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হয় না তা নয়। তবে আঙুলে গোনা যায়।

কে একজন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—নিউটন চোট পেয়েছে। একটা আঙুল উড়ে গিয়েছে।

—কোথায় সে? কোথায়?

—আব্বাসের ঘরে। দাবাই দিচ্ছে। হাসপাতালে গেলেই ধরবে।

নিউটনের আপন বলতে রয়েছে এক পিসি। সে চেঁচিয়ে ওঠে—হত-ভাগার সব সময়েই চোট লাগে। সেবারে পায়ে চোট লাগল। হাত-পাগুলো সবসময় ল্যাংব্যাং করে। যাই দেখিগে—

—একে ঘরে নিও না পিসি। দাবাই দেওয়া হয়ে গেলে খালের ওপাশ দিয়ে বার করে দিও। এখুনি পুলিশ এসে তছনছ করবে সব।

আচ্ছা। কোন্ আঙুল গেল কে জানে? বুড়ো আঙুল গেলে তো হয়ে গেল।

সতীশ ড্রাইভার বলে—বুড়ো আঙুল যায় নি। কড়ে আঙুল। আমি দেখেছি।

পিসি চলে গেলে একজন প্রশ্ন করে—তুমি কি করে দেখলে?

—আমার ঘরের সামনে দিয়ে গিয়ে করালী পিসির ঘরের পেছন দিক দিয়ে আব্বাসের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সেই সময় নেংড়া-শেতল খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়াল সবার মধ্যে। প্রৌঢ়ত্ব ছুঁই ছুঁই করলেও এখনো সুবিশাল চেহারা। মাথায় সবার ওপরে। শক্ত-সমর্থ।

নির্বিকার ভাবে বলে—ন্যাটা-হাবু চলে গেল শুনলাম।

কেউ ওর কথার কোনো উত্তর দেয় না। প্রয়োজন বোধ করে না—বোধ হয় বিতৃষ্ণায়।

নিজেই লাশটার দিকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে বলে—জানতাম যাবে। কবে থেকে বলছি গরমেণ্টের দলে নাম লেখা। শুনলো না। এরাও যাবে।

ঘোতনার মা ফোঁস করে ওঠে—তুমি তো গরমেণ্টের দলে নাম লিখিয়ে-ছিলে। হাজত থেকে খোঁড়া হয়ে ফিরেছিলে কেন?

নেংড়া-শেতলের চোখ ধক্ ধক্ করে উঠলো মুহূর্তের জন্য। কিন্তু ওই-টুকুতেই শেষ। তার জীবনের বসন্ত বিদায় নিয়েছে পনেরো বছর আগে। তাই সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা ভাবে বলে—ভোটে হঠাৎ সেই গরমেণ্টকে

ফেলে দিল যে—

—এই গরমেণ্টও পড়তে পারে।

শেতল অসহিষ্ণু হয়ে বলে—ওসব তুমি বুঝবে না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানা আছে। যত বোঝ তুমি।

এ পাড়ার ঘোতনার শরীরে সব চেয়ে বেশী শক্তি। তবে মাথাটা তার একটু মোটা। তবু সবাই ঘোতনার মাকে সমীহ করে। নইলে আর কেউ এতদিন পরেও শেতলের সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে সাহস পেত না।

ন্যাটা-হাবুর মায়ের জ্ঞান ফিরতে না ফিরতেই থানা থেকে পুলিশ এসে হাজির হয়। থানার ও. সি, অর্থাৎ বড়বাবু হাবুর লাশের কাছে এসে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে—এঃ, মাথায় লেগেছে দেখছি। কে পড়ল ?

উপস্থিত কেউ জবাব দেয় না।

—কি হলো ? সব বোবা হয়ে গেলে দেখছি। এ পাড়ার কেউ নাকি ?

তবু উত্তর নেই।

—হুঁ। দেঁতো কাশীর দলের কেউ হলে তোমাদের কপালের দুঃখ আমিও বোধহয় খণ্ডাতে পারব না।

শেতল একটু একটু করে সামনে এগিয়ে আসে।

বড়বাবু হেসে বলে—আরে শীতল চৌধুরী যে। আচ্ছা শেতল কে পড়ল বলতে পারো ? দেঁতো কাশীর দলের ?

—না বড়বাবু। অপোজিট দলের।

—তাই নাকি ! তবু ভালো। রামশরণ—

—জী হোজুর।

—লাশের মুখটা একটু ঘুরিয়ে দে তো দেখি।

রামশরণ একজন কনস্টেবল। বড়বাবুর স্পেশাল। বড়বাবুর যে কোনো কাজ করতে তার কোনো আপত্তি নেই। এতে ফায়দা অনেক। আর সবাই তো বিট্-ডিউটি করে। তাতে পরিশ্রম আছে অথচ রস নেই ততটা। সুতরাং বড়বাবুর হুকুম অবশ্যপালনীয়। নইলে স্পেশাল-গিরি তার ঘুচে

যাবে।

রামশরণ মুখখানা ঘুরিয়ে দেয়। বড়বাবু চিনতে পারে না বিকৃত মুখ। রামশরণ কিন্তু ঠিক চিনে ফেলে। তার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি—হোজুর, চিনতে পারলেন না ? ন্যাটা-হাবু।

—তাই নাকি ? ন্যাটা-হাবু শেষ পর্যন্ত এ ভাবে মরল নিজের ঘরের কাছে ?

বড়বাবু একটু অবাক হয়। তবে স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলে সেই সঙ্গে। এলাকা জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবে।

তার মনোভাবকে কথায় রূপ দেয় রামশরণ। সে হাসতে হাসতে বলে—ঠাণ্ডা থাকবে হোজুর।

ঘোতনার মা বলে ওঠে—হ্যাঁ, খুব ঠাণ্ডা থাকবে। বড়বাবু যদি দেঁতোকে ফেলতে পারেন তাহলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরের মতো শান্তি হবে। আপনাদের ভোরের ঘুম নষ্ট হবে না। বউ-এর হাত-পা গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে ছুটতে হবে না—

বড়বাবু চেঁচিয়ে উঠে বলে—রামশরণ—

রামশরণ লাফিয়ে উঠে বলে—হোজুর।

বড়বাবুর মুখ দিয়ে আর একটু হলে খিস্তি বার হয়ে যেত। সে জানে পুলিশের মাথা গরম করলে চলে না। কিন্তু পরিস্থিতি সব উল্টোপাল্টা করে দেয়। কাল রাত দুটোর সময় থানার ওপরে কোয়ার্টারে গিয়ে শুয়েছে। পৌনে চারটের সময় খবর পেল এখানে বোমাবাজী চলছে। ঘুম হলো না, তারপর এই সব ঝগড়ুটে প্রৌঢ়া মহিলাদের ব্যাপারে তার একটা এলার্জি আছে। কিন্তু খিস্তি খেউড় থানার চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা আজকাল নিরাপদ। তার পর এ মহিলা। জিভের ডগায় 'খানকি' কথাটা এসে গিয়েছিল আর একটু হলে। সামলে নিয়ে বলে—ভদ্রমহিলা কে রে ?

—হোজুর। ও ঘোতনার মা।

—হুঁ।

শেতল ভাবে হাবু অপোজিট দলে থেকেই ভাল করেছিল। গরমেণ্টের পার্টির দলে গেলে কেমন যেন নোকর নোকর মনে হয় নিজেকে। পুলিশ যদিও শাসায়, পীড়ন করে, খিস্তি শোনায়, হাজতে ভরে, তবু নিজের স্বাধীনতা থাকে—সম্মান থাকে। আজ ওই হাবুর লাশ সটান্ পড়ে রয়েছে, যেন কোনো নবাব-পুত্রের লাশ। আর যেদিন সে খোঁড়া অবস্থায় কোনোরকমে ঘরে ফিরে এসেছিল সেদিন বস্তির কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। যারা তাকিয়েছিল তাদের চোখে ঘৃণা ছাড়া কিছুই দেখতে পায় নি। আলতাফের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা চাইলে, কত গড়িমসি করেছিল সে এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেই দুঃখে নিজের ঘরে চায়ের ব্যবস্থা করেছে। সে যেন একটা বেতো ঘোড়া। কোনো মূল্য নেই। সেদিন গরমেণ্টের দলে না থাকলে পাড়ায় তার সম্মান অটুট থাকত। আজ সে বিরাট দেহ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে কিছু কিছু লোক যারা তার আগের প্রতাপ দেখেছে, তারা এখনো তার মুখের ওপরে কথা বলতে ইতস্তত করে বটে, কিন্তু হাবুই প্রকৃতপক্ষে এতদিন রাজত্ব করছিল। তাই প্রায় সবাই তাকে তুচ্ছ করে। অথচ এদের জন্যে কম তো করে নি সে। ওয়াগান থেকে বস্তা বস্তা গম আনিয়ে এদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। ওই শিবুর পিসির বিয়ে হচ্ছিল না টাকার অভাবে। কে টাকা দিয়েছিল? এই শর্মা। সবাই সব ভুলে যায়। আজ যে দেঁতো কাশী দল-বল নিয়ে এসে হাবুকে মেরে রেখে গেল পারতো তার সময় হলে? গরমেণ্টের দল হলেই বা কি! এত সাহস হতো না। তবু সে আজ পরিত্যক্ত।

শেতলের চিত্তাকাশে মুহূর্তের জন্য একটা জ্যোতি জ্বল্‌জ্বল্ করে ওঠে। সেই জ্যোতিতে তার দিব্যদৃষ্টি যেন উন্মোচিত হয়। নিজের বিশাল চেহারার দিকে একবার দৃষ্টি ফেলে সে। অশক্ত ও চির-আহত বাঁ পায়ের দিকে তাকায় একবার। সে জানে কে তার এই দশা করেছে। পুলিশ

নয়। পুলিশই হাজতের মধ্যে অন্য আসামীদের টিপে দিয়েছিল। তারা ছুতো করে ঝগড়া বাধিয়ে এই হাল করেছে। কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলেই পাজী। সেদিন যারা সিংহাসনে ছিল তাদের জন্য সে কী না করেছে। অথচ বাজারে যখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো তখন সে ফালতু মাল। ওরা তাকে বিশ্বাস করেনি পুরোপুরি। ওদের আশ্রয়ে তখন আর এক শেতল এসে জুটেছে। সেই নতুন শেতলের সঙ্গে বাড়তি ছিল কলেজের বিদ্যা। শেতল সেই তুলনায় বলতে গেলে মুখ্যু। তাই পুরোন শেতলকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিল।

আজ হাবু মরেছে। হাবু সম্মান নিয়ে মরেছে। রাষ্ট্রপতির পদে থাকতে থাকতে কিংবা প্রধান মন্ত্রীর পদে থাকতে মরার মতো। সেই সম্মানের কিছুটা ভাগ সে যদি এই বয়সেও আদায় করতে পারে তাহলে বাকী জীবনটা ঘেয়ো কুকুরের মতো বাঁচতে হবে না। আর বছর দশ বারো পরে তো বার্ধক্য এসে তাকে আক্রমণ করবে। এই কয়টা বছর একটু অমৃতের আস্বাদন যদি পাওয়া যায় তা হবে স্বপ্ন। শেতলের মনের ভেতর ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে।

হঠাৎ শেতল হুংকার দিয়ে ওঠে—তোরা সব আয় তো। এ লাশ নিয়ে যেতে দেবো না। দেঁতো-কাশীকে আগে ধরতে হবে তারপর লাশে হাত। সরকারী পার্টির তাঁবেদার হওয়া চলবে না পুলিশের।

সবাই বলতে গেলে স্তম্ভিত। প্রথমে সবার মধ্যে একটা দ্বিধা। এ ওর দিকে যায়। ব্যাপারটা কেমন হলো?

তাদের হাবভাব দেখে শেতল আবার চেঁচিয়ে ওঠে—আমি আর গরমেন্টের দলে নেই। খুব শিক্ষা হয়েছে। বুঝতে পেয়েছি আসল চিজ্‌ ইজ্জত। তোরা আয় দিকি এদিকে সব।

পুরোনো সবাই আসল শেতলকে দেখতে পেল বহুদিন পরে। ব্যাটার ঘুম ভাঙলো অবশেষে। ভালোই হলো।

একে একে যুবা বৃদ্ধ বালক সবাই এগিয়ে এসে লাশকে ঘিরে দাঁড়ায়।

সবাই তারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে শেতলের দিকে চাইতে থাকে। অদ্ভুত দৃষ্টি বড়বাবুর চোখেও। শেতলকে সে নখদন্তহীন এক বাঘ বলেই জানত থানায় আসার পর থেকে। হঠাৎ এ কি পরিবর্তন। পরিস্থিতিটা একেবারে পাল্‌টে গেল যে। সামান্য কয়জন পুলিশ নিয়ে এখন কি করা যায়? শেতলের সামনে এগিয়ে গিয়ে বড়বাবু বলে—শেষে, তুমি শেতল এদের উস্‌কে দিলে? তোমার ওপর আমাদের আস্থা ছিল।

—আস্থা ফাস্তা ভুলে যান বড়বাবু। অন্য পাড়া থেকে এসে ঘুমন্ত ছেলে-টাকে মেরে রেখে গেল? এর প্রতিবিধান চাই। আপনারা এখানে কেন? ও পাড়ায় যান! খুনীদের ধরুন।

—আগে লাশ নিয়ে যেতে দাও। তারপর ধরব ওদের।

—আপনারা ধরবেন না। ধরবেন এপাড়ার অন্য সব ছেলেদের। জানা আছে। আগের গরমেণ্টও তাই করত।

—এদেরও ধরব। এরা ধোয়া তুলসী পাতা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে শেতল শ্লোগান দেয়—লাশ নেওয়া চলবে না।

প্রতিধ্বনি ওঠে—চলবে না, চলবে না।

বড়বাবুর হাত কামড়াতে ইচ্ছে হয়। এখন বুঝতে পারে, ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার আগে অবস্থা শান্ত থাকতে থাকতে লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মস্ত ভুল হয়ে গেল। মড়ার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে গিয়েই বিভ্রাট। থানার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলে ল্যাটা চুকে যেত। পরে রক্তটক্ত ধুয়ে ফেলা যেত। ইস্‌, কী বোকামী।

বস্তির যারা ভেতরে ছিল তারাও পিলপিল করে বাইরে চলে আসে। শ্লোগানের পর শ্লোগান। একটা ওয়্যারলেশ ভ্যান সেই সময় এসে উপস্থিত হয়। বড়বাবু ভাবেন, তবু রক্ষা। কিছু ফোর্স বাড়ল। তাছাড়া যোগাযোগ করা যাবে কণ্ট্রোলরুমের সঙ্গে। তার নিজের গাড়ির ওয়্যার-লেশ সেট্‌ কাজ করছে না। সে তাড়াতাড়ি অফিসারকে ডেকে নির্দেশ দেয় আরও ফোর্সের জন্য বলতে। আর পরিস্থিতি যে ঘোরালো হয়ে

উঠেছে সেকথাও জানাতে বলে। সুপিরিয়র কোনো অফিসারের স্পটে আসা খুব জরুরী।

শীতল চৌধুরী ওরফে নেংড়াশেতল ততক্ষণ ভাষণ দিতে শুরু করেছে। কী হবে পুলিশকে খাতির করে? না হয় তার বাকী ঠ্যাংটা খোঁড়া করে দেবে ওরা। তার বেশী তো নয়। সংসারে তার কেউ নেই। বিয়ে করার অবকাশ হলো না। না, অবকাশ ছিল। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যাত। একজন তাকে ভালবাসত। হ্যাঁ, এই বস্তিতেই থাকে। এখানেই বিয়ে হয়েছে। ভীড়ের মধ্যে তার সুন্দর মুখটাও উঁকি দিচ্ছে। এত বয়সেও বয়স বেশী বেড়েছে বলে মনে হয় না। এখনো তাকে দেখলে ঠাণ্ডা রক্ত কেমন ছলাৎ করে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রমণী ঘৃণায় ফিরিয়ে দিল সরকারী কুকুর বলে। বড় ভুল করেছিল শেতল। যে তরুণী তাকে হৃদপদ্মে বসিয়েছিল সে-ই নাক ফলিয়ে বলেছিল "কুকুর।"

শেতল আলতাফের দোকানের একটা বেঞ্চি টেনে তার ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়। বলে—লাশ আমরা কিছুতেই ছাডব না। আমাদের গুলি করুক ওরা। মেরে ফেল্‌ক। তবু হাবুর লাশ আমরা নিয়ে যেতে দেবো না। দাঁতো কাশীর শাস্তি চাই। তার দলবলকে এ্যারেস্ট করতে হবে। ও পাড়ার গুণ্ডাদের পাড়া-ছাড়া করতে হবে। সরকারী পার্টির গুণ্ডাবাজী চলবে না। ভোট আসছে। প্রথমে কর্পোরেশন, তারপর নাকি বিধানসভা লোক-সভা। তাই এই গুণ্ডাবাজী। এলাকা দখলের লড়াই চালাচ্ছে ওরা। বুঝি না ভেবেছে? আমরা দাঁত দিয়ে ঘাস কাটি না। আমরা ঘি দুধ না খেলেও চালের খুদ রেশনের পচা চাল হলেও তার ভাত খাই। পচা গম হলেও তারই রুটি খাই। আমি শেতল, এইসব কারবার অনেক দেখেছি।

বড়বাবু বড় বড় চোখে সব দেখে, সব শোনে। রামশরণ একবার বড়বাবুর কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলে। বড়বাবু ঘাড় নাড়ে। সেই সময় সাব্‌ইন্সপেক্টর বমন এসে পৌঁছায় একটা গাড়ি যোগাড় করে। ছেলেটা চট্‌পটে। খবর শুনে নিজেই চলে এসেছে। থানার সিপাহীরা পুতুলের

মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আদেশ না পেলে তাদের করার কিছুই নেই। শেতল লক্ষ্য করে, তার বসন্তকালের প্রেয়সী চন্দ্র-মিস্ত্রির জরু তার দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে। মুখখানা এতদিনেও সুন্দর আর ছিমছামই রয়েছে। চন্দ্রমিস্ত্রি ও মুখকে তুবড়ে দিতে পারে নি। আফসোস হচ্ছে নাকি প্রেয়সীর। হয় হোক, না হয় না হোক। তবে চন্দনা পারত তাকে ঠিক পথের হদিশ দিতে। যদি একটু ছল্‌ছল্‌ চোখে বলত শুধু—সবাই তোমাকে ঘেন্না করছে। তুমি গরমেণ্টের সঙ্গে থেকো না। সে তাহলে নিশ্চয় সরে আসত সেদিন। তার মনের ওপর চন্দনার এই প্রতিপত্তি সেদিন ছিল। কিন্তু চন্দনাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আরে, কার জন্য সে গরমেণ্টের নোকর হতে গিয়েছিল? ওই চন্দনার জন্যই তো। ও সুখে থাকবে, বিধবা হবার কিছুটা ভয় কমে যাবে, তাই না তার মতিচ্ছন্ন। নইলে কে যেত? চন্দনা কাছে এলেই চন্দনের গন্ধ পেত সে। আশেপাশের কারখানার চামড়া-পচা গন্ধ ধাপার ময়লার গন্ধ কোথায় মিলিয়ে যেত। মনে হতো, কোথাও বুঝি শিউলি কিংবা গন্ধরাজ ফুটেছে। সে সুবাস যতটা না চন্দনার দেহের তার চেয়েও বেশী শেতলের মনের।

বড়বাবু এগিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করে। ফোর্স এখনও অপ্রতুল। গত শীতে এইরকম একটা গণ্ডগোল সামলাতে গিয়ে ওপাশের থানার মেজ-বাবু বোমা খেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল বাঁধাকপির ক্ষেতে। আর ওঠে নি। বড়বাবু বোধহয় তাই ভাবছে। ভাবুক। যতক্ষণ ভাবে ততক্ষণ শেতলের খাতির। সে জানে ন্যাটা হাবুর কড়া নির্দেশ ছিল পুলিশের গায়ে কখনো হাত না দিতে। ছেলেরা সেটা মানে। হাবুটা বুদ্ধিমান ছিল। বেঁচে থাকলে কর্পোরেশন-টেশনে দাঁড়াতে পারত। ভাগ্য ভাল হলে আরও উঁচুতে উঠতে পারত। ছেলেটা ইস্কুলের গণ্ডী পার হয়েছিল।

হাবুর মায়ের জ্ঞান ফিরেছে। আগেও দুএকবার ফিরেছে। কিন্তু থেঁতলে যাওয়া রক্তাক্ত মাথা দেখে আবার জ্ঞান হারিয়েছিল। এবারে সামলে

নিয়েছে। কাঁদার চেষ্টা করছে। গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে না। ঘোত্‌নার মা তাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। ঠিক সামলে নেবে হাবুর মা। ওর স্বামীও দুর্ঘটনায় মরেছিল। তাইতো এই বস্তিতে বাস। স্বামী কাজ করত সওদাগরী অফিসে। থাকত চার নম্বর পুলের কাছে দালান-কোঠা এলাকায়। বিয়ের চার বছর কাটতে না কাটতেই পা হড়কে ডবল ডেকারের নীচে। তাই এখানে চলে আসতে হয়। পাম্‌ এভেন্যুর দিকে নানান বাড়িতে কাজ করে ছেলের ইস্কুলের খরচ চালিয়েছে। খুব শক্ত ধাতের স্ত্রীলোক হাবুর মা। ঠিক সামলে নেবে।

কিছুক্ষণ পর গাড়িতে অনেক পুলিশ এসে গেল। ওদের পরই কালো জীপে করে এলো এলাকার বড় সাহেব অর্থাৎ এ সি।

নেমেই বড়বাবুকে প্রশ্ন করে– কি হয়েছে?

বড়বাবু ধীরে ধীরে সব কিছু বলার পর বড় সাহেব বলে—ইস্‌ লাশটা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে পারলেন না?

বড়বাবু চুপ করে থাকে। সত্যি তার ভুল হয়েছে।

বড়সাহেব জড়ো হওয়া মানুষদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে—কে এই লাশ আটকেছে?

নেংড়া-শেতল নিজের বকে বড়ো আঙুল ঠুকে বলে—এই আমি। আমি শেতল। আমাকে আপনি চেনেন স্যার। আমার সময়ে এই থানার সেকেণ্ড অফিসার ছিলেন আপনি। বড় সাহেব হয়েছেন দেখছি। অনেক উন্নতি হয়েছে। দেখেও আনন্দ।

বড় সাহেব কাষ্ঠহাসি হেসে বলে—অ্যারে শেতল যে—। কিন্তু তুমি তো—

– আজ্ঞে অপোজিট পার্টিতে নাম লেখালাম আজ থেকে। দেঁতো কাশী এ পাড়ায় এসে উৎপাত করে যাবে, সহ্য হলো না। আমি থাকতে সেদিনের ছোকরা রোয়াব দেখাবে এটা চলতে পারে না। ওর গাল টিপে যতদিন দুধ না বার করতে পারছি ততদিন আমি অপোজিট পার্টির। তারপরেও এই পার্টিতেই থাকব ভাবছি।

—কী সব বলছ ? অপোজিট পার্টি আবার কি ?

—সব বোঝেন স্যার। আমিও বুঝি। দেঁতো কাশীর গায়ে আপনারা হাত দিতে পারবেন না। কঠিন ঠাঁই।

বড় সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে বলে—শোন শেতল, তোমার দিন আর নেই। শেষ হয়ে গিয়েছে। উট্‌কো ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করো না। লাশ ছেড়ে দাও।

—চেষ্টা করুন না। লাঠি চালান। গ্যাস ছাড়ুন। গুলিও ট্রাই করতে পারেন। লাশ ওখানেই থাকবে। এক চুলও নড়বে না।

বড় সাহেব ফোর্সকে গাড়ি থেকে নীচে নামার আদেশ দেয়। তারা লাফ দিয়ে নেমে সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে বলে মনে হয় এবারে। একদিকে জনার্পচিশেক সশস্ত্র পুলিশ অন্য দিকে সাড়ে তিনশোর ওপর বস্তিবাসী। তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক আর বাচ্চার সংখ্যাও কম নয়।

নেংড়া শেতল চেঁচিয়ে বলে—শুনুন বড় সাহেব। আপনাকে দিয়ে হবে না। আপনি লাঠি গ্যাস কিছুই চালাতে পারবেন না। সেই হিম্মত আপনার নেই—আর কেউ না জানুক আমি জানি আজ আপনি এ সি. হলেও সেদিনের মেজবাবুই তো। বরং আপনাদের কেষ্ট বিষ্টুদের ডাকুন। একটা মীমাংসা হতে পারবে। আমাদের দাবী হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার। কথা দিতে হবে।

সূর্যের তেজ যত বাড়ছে পরিস্থিতি তত গরম আর ঘোরালো হয়ে উঠছে। ধাপার মাঠের পচা গন্ধ থেকে থেকে ভেসে আসছে। বস্তিবাসীর নাকে সেই গন্ধ লাগে না—সয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশের নাকে লাগছে। তবে রামশরণের লাগছে না। সে থানা এলাকা চষে বেড়ায়।

একসময় শেতল বিস্ময়ে লক্ষ্য করে চন্দ্রমিস্ত্রির বউ চন্দনা একেবারে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আর এসে কি হবে! এখন কি আর সেই মন সেই যৌবন রয়েছে? যদি পনেরো কি বিশ বছর আগে এইভাবে

এসে দাঁড়াত তাহলে পৃথিবীটাকে আমরা খোলামকুচি বলে ভাবতাম ! জীবনটাকে পালটে ফেলার মতো মনের জোর আর নেই। তবু ও কাছে এসে দাঁড়াতে ভালোই লাগে শেতলের। ওই তো দূরে ভীড়ের মধ্যে চন্দ্র মিস্ত্রিকে দেখা যাচ্ছে। তার চোখ দুটো ওদের দুজনাকে ভস্ম করে দিতে চাইছে। চন্দনাকে বিয়ে করতে পেরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করেছিল। পাড়ায় সেরা সুন্দরী ছিল চন্দনা। বিয়ের পরে মিস্ত্রি শেতলের দিকে যেভাবে চেয়ে থাকত তাতে বোধহয় অবজ্ঞাই ফুটে উঠতো। সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে তার মতো ডাকসাইটে মানুষকেও। সে যে তখন বেতো ঘোড়া। সবার ঘৃণার পাত্র।

রাস্তার ধারের কলের জল পড়েই যাচ্ছে। এ এলাকায় জলের এত অপচয় কেউ দেখে নি। অন্যদিন হলে এতক্ষণ সেখানে চেঁচামেচি আর মুখ-ঝামটা চলত সমানে। আজ সবার বুঝি জলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। রান্নাবান্নার কথা কেউ ভাবছে না। একটু পরেই যে কাচ্চাবাচ্চারা কেঁদে উঠবে সেকথাও কারও মনে হচ্ছে না।

জলের প্রয়োজন হলো শেতলের। পিপাসার জল। পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উত্তেজনায় তার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। অনেকদিন অভ্যাস নেই। বয়সও হয়েছে। পাশের একজনকে বলে—আলতাফের দোকান থেকে একটা গেলাশ এনে দেতো। জল খাবো।

যাকে বলল, সে নড়ার আগেই চন্দনা ছুটে চলে গেল। একটু পরে এক গেলাশ জল এনে শেতলের দিকে বাড়িয়ে দিতে তার হাত সামান্য কেঁপে উঠলো। শেতল টের পেল। এখনো কাঁপে চন্দনা আগের মতো। যৌবন এখনো আছে বটে।

—আর আনব। চন্দনা শুধোয় মৃদুকণ্ঠে।

—না।

বয়স্ক কিছু স্ত্রী-পুরুষের মুখে ফিকে হাসি খেলে যায়। চন্দ্রমিস্ত্রির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

বড় সাহেব এগিয়ে এসে বলে—শোন শেতল। তোমাদের শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি। লাশ ছেড়ে দাও। নইলে আমরা এ্যাক্শন নিতে বাধ্য হব।

—নিন না এ্যাক্শান। আগেই বলে দিয়েছি, লাশ ওখানেই পড়ে থাকবে। আপনাদের ওপরওলা এসে কথা দিন আগে। আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, এক ঘণ্টা পরে আমরা মন্ত্রীকে আসার দাবী জানাব।

বড় সাহেব রাগে গজগজ করতে লাগল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলো না। একটু পরেই বড়সাহেবের চেয়ে উঁচু পোস্টের অফিসার ডি. সি. এসে উপস্থিত হয়। বড় সাহেব তাকে শেতলের সামনে নিয়ে আসে।

ডি. সি বলে—আপনাদের দাবীর কথা আমরা শুনলাম।

—দেঁতো কাশীর শাস্তি চাই।

—শাস্তি দেবার মালিক আমরা নই। আদালত।

—জানি স্যার। আমি বলতে চাই আইনের ফাঁক-ফোকর রাখবেন না। মনে রাখবেন আজকেই শেষ দিন নয়! দিন পড়ে আছে। এর ব্যবস্থা না হলে আগুন জ্বলবে।

ডেপুটি কমিশনারের বয়স কম হলেও স্থির মস্তিষ্কের ভদ্রলোক। সে বলে—ওসব পরের কথা। এখন লাশ ছেড়ে দিন।

বস্তীবাসীরা গুঞ্জন করে ওঠে। শেতল তাদের থামিয়ে দিয়ে বলে দেঁতো কাশীদের ছেড়ে দিয়ে হাবুর দলের পেছনে লাগবেন না।

ডি. সি. শুধু বলে—লাশ ছেড়ে দিন।

—লাশ কখন ফেরত পাব?

—মনে হয় আজ বিকেলের দিকে পেয়ে যাবেন।

শেতল সবাইকে বলে—আমরা লাশ ছেড়ে দেব। ডি. সি. সাহেব নতুন লোক। এর কথায় বিশ্বাস করছি। যদি দেখা যায় ইনিও ধোঁকা দিয়েছেন তখন আমরা ব্যবস্থা নেব। আপনারা স্যার লাশ নিয়ে যান। আমরা ওই লাশ নিয়ে মিছিল বার করব আজ সন্ধ্যায়।

সেই সময়, হাবুরা যে নেতার আশ্রিত সেই বীরেন বটব্যাল একটা গাড়ি করে হন্তদন্ত হয়ে আসে। পুলিশকে লাশ তুলতে দেখে হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠে—ছেড়ে দিলে তোমরা ?

শেতল তার দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলে—হ্যাঁ।

—তুমি ! তুমি এর মধ্যে আছো ? বুঝেছি ! নইলে এত সহজে লাশ হাতছাড়া হয় ? ষড়যন্ত্র। সরল বস্তীবাসীদের পেয়ে—

সবাই তীব্র প্রতিবাদ করে বলে—না না, শেতলদা আজ থেকে অন্য মানুষ। ফালতু কথা বলবেন না।

—তাই নাকি ? ভোল পালটানো কেন আবার ? কী মতলব ?

শেতল ওরফে শীতল চৌধুরী শান্ত কণ্ঠে বলে—দেখুন বীরেনবাবু আমার পেছনে লাগবেন না। আপনারই ক্ষতি হবে।

—ক্ষতি ? তুমি ক্ষতি করবে ?

বস্তিবাসীদের একজন বলে ওঠে—শেতল সব পারে। কুম্ভকর্ণ জেগেছে। শেতল এতদিন শেতল ছিল, এখন গরম হয়েছে। ওর খেল তো আপনি দেখেন নি। মেলা বক্‌বক্‌ করলে আপনারই অসুবিধে হবে।

বীরেনবাবু রীতিমত থতমত খেয়ে যায়। শিবু তাকে গিয়ে খবর দেবার কিছুক্ষণের মধ্যে সে এখানে চলে এসেছে। শিবুরা একটু দেরিতে গিয়েছিল। তবু এমন কিছু দেরি হয় নি। আর শিবু নিজে থেকে শেতল সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল তাকে। এখানে এসে দেখে সব উল্টে পাল্টা হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যই চিন্তার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই লোকটা গোটা বস্তিকে হাত করে ফেলল। সাংঘাতিক তো। একে কাজে লাগতে পারে কর্পোরেশনের ইলেকশনে।

লাশ গাড়িতে ওঠে। যাবার সময় বড়বাবুর স্পেশাল হঠাৎ শেতলের পিঠে আস্তে টোকা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে যায়—তুমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হোবে।

শেতল হাসে। থানা স্পেশাল সম্বন্ধে তার জ্ঞান আগে থেকেই আছে।

রবার ফ্যাক্টরীর পাশে এক কানাগলির শেষ প্রান্তে নিমগাছের নীচে বাঁধানো বেদী। শিবুর দল সেখানে এসে মেলে। ফ্যাক্টরীর ইউনিয়ন তাদের দলের নিয়ন্ত্রণে। তবে কিছু কিছু কর্মী রয়েছে যারা পুলিশের ইনফরমার। তাদের সবাই চেনে। শিবুরা জানে এখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। তবু বীরেনবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাকে বলে আসা হয়েছে এখানে আসার জন্য।

শিবুর ধারণা নেংড়া শেতল ন্যাটা-হাবুর হদিস বলে দিয়েছে দেঁতোদের। আজ রাতেই নেংড়াকে খতম্ করতে হবে। ঘোতনা রাজী। সুখেন আর হারু নিজেদের মতামত খুব একটা দেয় না। আর মানিক তো এখনো ছেলেমানুষ।

ওদের অবস্থা এখন কিছুটা অনিশ্চিত। বীরেনবাবু না আসা অবধি কিছুই বুঝতে পারছে না। পুলিশ নিশ্চয় এতক্ষণে বস্তিতে ঢুকে পড়েছে।

সুখেন এখনো মাঝে মাঝে আপন মনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। আফশোস। দেঁতো কাশীকে লক্ষ্য করে মোক্ষম একটা পেটো ছেড়েছিল ওর গায়ে লাগল অথচ ফাটলো না। মাটিতে পড়ল তবু ফাটলো না। কাকেই বা দোষ দেবে। নিজের হাতে তৈরী মাল। মশলা খারাপ একথাও বলতে পারে না। অন্যগুলো ঠিক ফাটলো। সে জানে এর জন্য তাকে পরে কথা শুনতে হবে। সাতাশ নম্বর বস্তিতে বোমা তৈরীতে তার নাম এখন অন্য পাড়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। হাবু বেঁচে থাকলে এই ধরনের ব্যর্থতায় এমন কিছু বলত না। বললেও সবার সামনে বলত না। শিবুটা এখনো কিছু বলছে না। ঘোত্নাও বলছে না। হাবুর মৃত্যু তাদের বেসামাল করে দিয়েছে। বেসামাল সুখেনও কি কম হয়েছে ? সে জানে তাদের নেতা এখন থেকে শিবু। হাবু লেখাপড়া জানত—শিবুও কলেজে পড়েছিল একবছর। লেখাপড়া জানলে নেতা বলে মানতে বেশ ভালো লাগে। তার মা তার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছিল ? পারলো না তো। কর্পোরেশনের

স্কুলে নিজে রোজ গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত। তবু কিছু হলো না। ও সব ছাইপাঁশ মাথাতে ঢুকতো না। বস্তির সবাই যখন রাস্তায় খেলা করছে, মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে বেগুন মূলোটা তুলে নিয়ে আসছে, পচাজলের দুর্গন্ধের ভেতর থেকে গামছা দিয়ে তেলাপিয়ার আর ছোট ছোট মাছ ছেঁকে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে, শুয়োর ছানার পেছনে পেছনে ধাওয়া করছে, তখন সে কেন মিছিমিছি তবলার মতো মুখ করে বইখাতা নিয়ে বেঞ্চির ওপর বসে থাকবে ? তাই পালিয়ে আসত। মন আর কত সামলাবে ; সে তো আর একলা নয়। গুটিকয়েক ভাই বোন আছে। আর তাদের বাবা তো সারারাত বৌবাজার স্ট্রীটের দোকান-গুলো পাহারা দিয়ে এসে কোনরকমে পেটে কিছু দিয়ে মাদুরের ওপর গড়িয়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতো। এখনো তাই চলছে।

ঘোত্না বলে ওঠে—শালার বীরেনবাবুর কি হলো।

বেলা চড়বড় করে বেড়ে উঠেছে। দুএকজন পথ চলতি লোক দূর থেকে তাদের বসে থাকতে দেখেই উঁকিও দিয়ে গেল যেন। বিশ্বাস নেই। পুলিশের চামচা সর্বত্র।

শিবু বলে—চল। আর না।

হারু বলে—কোথায় যাবি ?

—বীরেনবাবুর বাড়ি।

—কেউ দেখতে পেলে ?

—পালাবি। তবে যেখানেই থাকিস সন্ধে হলে ব্রীজের কাছে রেল-লাইনের নীচে জমা হবি। নেংড়া শেতলকে আজই খতম করতে হবে। সবাই ঘাড় নেড়ে নিমগাছের নীচ থেকে উঠে দাঁড়ায়।

একটা কথা শিবুর মনকে ছুঁয়ে চলে যায়। আজ অপর্ণার সঙ্গে সিনেমায় যাবার কথা ছিল। সতীশ ড্রাইভারের মেয়ে অপর্ণা। তার কাছে সিনেমা দেখার প্রস্তাব করতে যে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে ঠিক নেই। কেমন ভয় ভয় করত। কী জানি তাকে পছন্দ করে কিনা। দেখলে তো

মুচকি হাসে। আড়চোখে তার দিকে চাইতেও দেখেছে। তাই বলে সোজা-সুজি বাইরে যাবার প্রস্তাব করা তো সহজ নয়। অন্য কোনো মেয়েকে অবিশ্যি সে, যে কোনো সময়ে বলতে পারে। কিন্তু অপর্ণার বেলায় যত দ্বিধা। ভাগ্যিস সে রাজী হয়ে গেল। বস্তির মধ্যে হলেও অপর্ণাদের ঘর দু'খানির একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ছাদ টালির হলেও দেওয়াল আর মেঝে পাকা। নীলচে সাদা রঙ ওদের ঘর দুখানির। একটা ঘরে টেবিল ফ্যান রয়েছে। সামনে ছোট্ট এক ফালি বারান্দা আছে। আলাদা স্নানের ঘর আর একটা পায়খানাও করে নিয়েছে সতীশ ড্রাইভার। ছেলে নেই। একমাত্র মেয়েকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গানও শেখায়। সপ্তাহে দুদিন সন্ধ্যায় দিদিমণি এলে অপর্ণা গলা সাধতে বসে। শিবুর খুব ভালো লাগে ওর গলা। ন্যাটা হাবু হাসত। শিবুর মতো দুর্ধর্ষ ছেলে অপর্ণার প্রসঙ্গে কেমন মিইয়ে যায়। মাঝে মাঝে বলতো, খেলিয়ে শেষ অবধি ডাঙায় তুলতে পারবি তো?

সতীশ ড্রাইভার কড়া ধাতের ততটা না হলেও তার গিন্নি ডেঞ্জারাস। সতীশ ড্রাইভার দেখতে নরম প্রকৃতির মনে হ'লে কি হবে পয়সা উপা-র্জনের ধান্ধা তার ষোলআনা জানা। যে কম্পানীতে সে গাড়ি চালায় সেই কম্পানীর মাসমাইনা ছাড়াও উপরি আয়ের নানান্ পথ তার জানা। সবাই বলে, ধাপার মাঠের মাঝখান দিয়ে যে সড়ক চলে গিয়েছে তার ওপাশে কোথায় যেন সে জমি কিনে রেখেছে। একদিন ওইসব এলাকাও কলকাতা হয়ে যাবে।

মানিক ফিক করে হেসে বলে—কি হলো শিবুদা।

—এঁ্যা।

ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না?

মানিক বয়সে ছোট বলে মাঝে মাঝে সবাইকে 'দাদা' বলে ডাকে। আবার রসের আলোচনা যখন হয় তখন একবয়সী হয়ে যায়।

হারু মানিককে ধম্‌কে বলে—চুপ শালা। নেতা এখন অপর্ণার কথা

ভাবছে।

শিবু চকিতে একবার হারুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে—একেবারে বুল্‌স্‌ অ্যাই। মানে জানিস ? লক্ষ্যভেদ।

—জানি জানি। আমারও তো একই রোজ।

শিবু একটু হাসে। সে জানে হারু কোথায় টোপ ফেলেছে। খুব কঠিন জায়গা। হাবু বলত, যারা রাজনীতি করে তাদের মেয়েদের দিকে হাত বাড়াতে নেই কখনো। সংসারে শান্তি থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ সে হাতের পাঁচটা আঙুল গুনে গুনে পাঁচটা কেস দেখিয়ে দিয়েছিল হারুকে। কিন্তু দেখালে কি হবে ? যার সঙ্গে যার মজে মন। হারুর এলেম আছে। চেহারা দর্শনধারী। ইংরিজী বুলি একটু আধটু শিখেছে। ভালো জামা-প্যাণ্ট পরলে দারুণ লাগে দেখতে। চালিয়ে যাক। যে যার বরাত নিয়ে চলে। নইলে হারু আজ জিতেই থামোকা অমন টেঁসে যাবে কেন ?

ওরা এগোতে থাকে। একসঙ্গে দল বেঁধে নয়। আগু পেছু ভাঙা ভাঙা অবস্থায়। পাইপগান ছুটো লুকিয়ে রেখে দিয়ে এসেছে। পেটোগুলো আপাতত কাটোয়া ডাঁটার ক্ষেতে। হাবু পড়ে যেতেই শিবু, তার কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়েছিল। সেটি তার সঙ্গে আছে। বেচারা হাবু ঘুমের ঘোর কাটার আগেই স্বর্গে চলে গেল। নইলে হাজার দেঁতো কাশীও ওকে টাচ করতে পারত না। ছুহাতে কী টিপ্। নিউটনের পিসি বলে সব্যসাচী। পিসি রামায়ণ মহাভারত খুব পড়ে। ওই সব মোটা মোট বই এবং বড় বড় বুলি ঝাড়ে।

বীরেনবাবুর বাড়ি হলো ওদের লক্ষ্য। বীরেন বটব্যাল। কর্পোরেশনের ইলেকশানে দাঁড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাই শিবুর মুখে ন্যাটা হাবুর কথা সকলে শোনা মাত্র পুরোনো গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল সাতাশ নম্বর বস্তীতে।

বীরেনবাবু একদিন হারুকে চুল্লু খেতে দেখে বসে পড়েছিল তার পাশে। খাবার ঢং দেখে মনে হয়েছিল চুল্লু না খেলেও উঁচুজাতের সাহেবী জিনিস

খাবার অভ্যাস হয়েছে। দলে হারু আর সুখেন মাঝে মাঝে ধেনো টানে। চুল্লু পেটে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরেনবাবুর এ্যাকশান শুরু হয়ে গিয়েছিল। কত কথা বলে ফেলেছিল।

ওরা রাস্তা ধরে চলছিল।

চলতে চলতে চেনা জানা লোকের সঙ্গে দেখা হলে মুশকিল। যাদের ওরা চেনে না অথচ যারা ওদের চেনে তেমন কোনো লোকের চোখে পড়ে গেলে আরও বিপদ। রাস্তাটায় দেঁতোকাশীর দলবল বড় একটা আসে না। ভয় পায়। তবু আজ কি হয় বলা যায় না। হ্যাটা হাবুকে ফেলে দিয়ে ওদের ইস্পিরিট হাই।

বীরেনবাবুর বাড়ি পৌঁছে ওরা প্রথমে আস্তে কয়েকবার ডাকে। কেউ সাড়া দেয় না। বাড়িতে এদিকে লোকের অভাব নেই, দুই ভাই, বাবা-মা, বউ—কেউ আসে না ভেতর থেকে।

শেষে ঘোত্‌না বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়াতে নাড়াতে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—ও বীরেনদা বাড়ি আছেন ?

তার ভাই ঘটাং করে দরজা খুলে মুখখানাকে বিকৃত করে বলে—দাদা বাড়ি নেই।

—কোথায় গিয়েছেন ?

—বলতে পারব না।

কথাটা শেষ করেই দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয়ে ঘোত্‌না একটা পা দরজার নীচের দিকে চালিয়ে দেয়।

—একি করছিস ?

—দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই।

—বন্ধ করব না তো কি হাট করে খুলে রেখে দেবো ?

—চটেছেন বলে মনে হচ্ছে ?

—চটবো না ? দাদা রাজনীতি করে বলে, আমরা মিনিটে মিনিটে উপদ্রব সহ্য করব নাকি ? দাদা বাড়িতে নেই। সকালে কে কি খবর দিয়েছিল—

সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছে। ব্যাস্। এবার যেতে পারেন।

শিবু মনে মনে ভীষণ চটে যায়। ভাবে রাজনীতি করে বলেই তো ব্যাটা গাড়ি-বাড়ি নিয়ে ফ্যাটের মাথায় থাকে। গুষ্টিকে ঘি-ভাত খাওয়ায়। নইলে এসব কাপ্তানী কোথায় থাকত। কাদের ঘাম রক্তের বিনিময়ে এসব হচ্ছে?

মুখে শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে—তারপরে আর ফিরে আসেন নি?

—না।

ওরা একটু বিভ্রান্ত হয়। এখন কি করবে? চলতে চলতে হাকু উষ্ণ স্বরে বলে—বীরেন শালাকে সম্‌ঝে দিতে হবে। বাড়িতে অমন ব্যাভার করলে ওর ভোটের বারোটা বাজিয়ে দেবো।

মানিক ফিক করে হেসে বলে—সমঝানোর দরকার কি? শেতলের সঙ্গে ওটাকেও সরিয়ে দাও।

সুখেন বলে—ঠিক বলেছিস। আমাদের প্রেস্টিজ নেই? এমন কুকুর তাড়ানো। সঙ্গে পেটো থাকলে ঝেড়ে দিতাম।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে বেলা বেড়ে যায়। এতক্ষণে পেট চুঁইচুঁই করে। পকেটে অল্প স্বল্প পয়সা ওদের আছে। একবার বস্তিতে গিয়ে ঘুরে আসতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু নিরাপদ হবে না সেটা। ওরা রেললাইনের দিকে রওনা হয়। ওধারে ব্রীজের নীচে যেখানে বাজার বসে সেখানে অনেকগুলো দোকান ওদের চেনা। তার মধ্যে যোগেনের সঙ্গে ওদের ভালোই ভাব আছে। ওর দোকান থেকে কিছু খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রেলপুলিশ আর থানা পুলিশও মাঝে মাঝে ওখানে ঘোরাফেরা করে। তবু উপায় নেই।

শিবু বলে—চার নম্বর ব্রীজ দিয়ে বড্ড গাড়ি চলে। যেন চৌরঙ্গী।

ওরা রেললাইনের বাজারের কাছে পৌঁছবার আগে একজন সাইকেলে করে ছুটে আসে। তাকে ওরা চেনে, তবে নাম জানে না। বীরেনবাবুর চামচা। বীরেনবাবু হালদার বলে ডাকে। ও শিবুদের সবাইকে চেনে।

ঠাট্টা করে সবাই বলে বীরেনের স্পেশাল।

—বীরেনদা ডাকছে তোমাদের।

—কোথায় ?

পার্কসার্কাস ময়দানে। শিগ্‌গির।

শিবু একটু গরম হয়ে ওঠে। বীরেনবাবুরই তার কাছে যাওয়ার কথা ছিল। যাহোক নিশ্চয় কোনো কারণ ঘটেছে। লোকটা ধুরন্ধর। কী করে বুঝল যে ওরা এখানে থাকবে ? সব খবরই ব্যাটা রাখে নাকি ?

ওদের খাওয়া হলো না। ঘোতনা চট করে জিজ্ঞাসা করে—বীরেনদার পকেটে মালকড়ি নিশ্চয় আছে। কী বল ভাই। আমাদের খিদে পেয়েছে। লোকটা এমন ভাবে চোখ পাকিয়ে চাইল যেন ভস্ম করে দেবে। ঘোতনা যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে। তারপর সাইকেলে উঠে বলে —সোজা চলে এসো।

লোকটা চলে যেতে সুখেন বলে ওঠে—শালা ওটাকে পেটো ঝেড়ে দিলে হতো।

চিন্তিত শিবুর মুখ ফসকে বার হয়—হয়তো ফাটতো না।

সুখেনের বুকের ভেতর চিন্‌চিন্ করে ওঠে কথাটা শুনে। এর অপেক্ষায় এতক্ষণ করছি না। দেঁতো কাশী ফসকে যাবার পর থেকে এই ধরনের বাঁকা কথা তাকে আরও কত শুনতে হবে। একটি মাত্র ব্যর্থতা এতদিনের সব কৃতিত্বের গায়ে কাদা লেপটে দিল। ঠিক আছে। দিন আবার আসবে। তখন তাকে মাথায় তুলে নাচার জন্য সে হয়ত আর ধরাধামে থাকবে না। ন্যাটাহাবুর মতো পাকা লীডার যাকে কখনো ঠেস দিয়ে কথা বলে নি, শিবু নেতা হয়ে কয়েক ঘণ্টা পার না হতেই এভাবে বলল ? মুখের ভেতরের স্বাদটা কেমন তেতো হয়ে গেল শিবুর কথা শুনে। নতুন বলেই কি বুঝতে পারল না শিবু ? দুদিন পরে নিশ্চয় বুঝতে শিখবে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গীদের এভাবে বলতে নেই। শিখবে বলেই সুখেনের বিশ্বাস। শিবু ছেলেটা ভালো। সে হয়তো মুহূর্তের জন্য ভুলে

গিয়েছিল, এখন সে নেতা। ন্যাটা-হাবু তাকে বিরাট একখানা সিংহাসনের ওপর বসিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে। ওই সিংহাসনের পাশে আর একটা সিংহাসনে অপর্ণাকে বেশ মানাবে মাইরি।

সুখেন হেসে ফেলে।

তার মুখে হাসি দেখে শিবু হালকা বোধ করে। একটা খোঁচা মারা কথা মুখ থেকে বার হওয়া অবধি তার স্বস্তি ছিল না। সুখেনের মতো দক্ষ কারিগরকে এভাবে বলা কখনও উচিত হয় নি। তাই তার মুখে হাসি দেখে শিবু বলে—তুই আমাদের গুরু।

ঘোত্না মানিক সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—কেন কেন?

শিবু বলে—আমরা চিন্তায় মরছি। আর সুখেন দিব্যি আছে।

সুখেন শিবুর কথায় সহজ হয়ে বলে—বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছিরে। নইলে দেঁতো কাশীকে ফস্‌কে কেউ হাসতে পারে?

শিবু বলে—ও সব ছেড়ে দে তো? একে বলে এ্যাকসিডেন্ট। অমন হতে পারে। আমাদের সবার কপাল। তোর একার নয়। তোর মতো ফ্যাক্টরী ম্যানেজার দেঁতো কাশীরা জন্মেও পাবে না।

সুখেন হাল্‌কা বোধ করে। কিছুটা খুব তাড়াতাড়ি ভালো নেতা বনে যাচ্ছে।

পার্কসার্কাসের ময়দানে একটা বিরাট গাছের নীচে বসে ছিল বীরেন বটব্যাল। রঙ ময়লা, তবু লাল লাল দেখাচ্ছে মুখখানা। রোদে পুড়ে নয়। চটে রয়েছে এদের ওপর।

ওরা কাছে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে—তোরা কী সব উল্টোপাল্টা রিপোর্ট দিস্‌।

শিবু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—আপনার নিমতলায় যাবার কথা ছিল না? আমরা বহুক্ষণ ওখানে বসে ছিলাম।

ঘোত্না ভাবে, দারুণ দিলে তো শালার শিবু। বীরেনবাবু ভড়কে গিয়েছে।

বীরেনবাবু তেমনি ভাবে বলে—যাব কি করে ? এদিকে কি হয়েছে জানিস ?

শিবু সেকথায় কান না দিয়ে বলে—দাঁড়ান, আমার কথা আগে শেষ হোক। আপনি কি বাড়িতে বলে রেখেছেন যে আপনি না থাকলে আমরা গেলে আমাদের কুকুর তাড়ানো তাড়াতে ?

ঘোত্‌নাদের চওড়া বুক নেতার গর্বে সাঁ সাঁ করে ফুলে ওঠে। বীরেনবাবু কেমন যেন ধাক্কা খায়। আমতা আমতা করে বলে—কেন, কেন ? তা বলতে যাব কেন ? কী হয়েছে ?

বীরেনবাবুর চামচার মুখখানা ঠিক মালপোর মতো দেখতে লাগে। সে এ ধরনের কথা কখনো বলতে শোনে নি তার মুরুব্বিকে উদ্দেশ্য করে। একটু আগে খুব রোয়াব নিচ্ছিল।

শিবু বলে—আপনার ভাই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের। চামচার সামনে এই কথায় বীরেন বটব্যালের কান গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু রাজনীতি আজব জিনিস। অনেক সময় অনেক কিছু হজম করে যেতে হয়।

সে বলে—সত্যি ? ভীষণ অন্যায় হয়েছে। আমি গিয়ে একটা ব্যবস্থা নেব। তেমন হলে নিজে আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব। বাড়ির লোকের চেয়েও আমার কাছে পার্টি বড়। তোদেরও তাই, কি বলিস ? কথায় কথায় অপমান গায়ে মাখিস না। বসে পড়্ তো। যা বলছি শোন। তোদের রিপোর্ট সব উল্টোপাল্টা।

ঘোত্‌না এতক্ষণ পরে বলে—আমাদের কোন্ রিপোর্টের কথা বলছেন আপনি ?

তোদের রিপোর্ট হলো, নেংড়া-শেতল পুলিশের লোক। সে নাকি হাবুর হদিস্ দিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে কি দেখলাম জানিস ?

—কী।

—শেতলই হিরো। হাবুর চেয়েও বড় হিরো।

শিবুরা আশ্চর্য হয় বীরেনবাবুর কথায়। বীরেনবাবু তখন যা যা স্বচক্ষে দেখে এসেছে বিস্তারিতভাবে ওদের শোনায়। ওরা স্তম্ভিত হয়ে শোনে। বিশ্বাস হতে চায় না। শেতল ব্যাটা অন্য কোনো কৌশল ফাঁদছে না তো ! কিন্তু তাহলে বস্তির সবাই ওর কথা শুনবে কেন ? তাদের মধ্যে চালাক বুদ্ধিমান মানুষ বহু আছে।

ওদের পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে বীরেনবাবু ভাবে এই সময় ওদের একটু শান্ত করা দরকার। নইলে বিপদ আসতে পারে । ভাইটা লেখাপড়া ছাড়া কিছু বোঝে না। চটাং চটাং কথা বলে শুধু। কবে এরা পেটো ঝেড়ে শেষ করে দেবে ওকে। শেতলটা যদি সত্যিই আবার উঠতে পারে তাকে হয়তো রাখতেই হবে। ও যা দেখালো রীতিমত এলিমেন্ট আছে ওর মধ্যে।

—চল তো আগে কিছু খেয়ে নিবি তোরা। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। দরগা রোড থেকে বাসে উঠবি চল্।

মানিক বলে—আপনার গাড়িখানা কোথায় বীরেনদা ?

—সেটা বাড়িতে রেখে এসেছি। মার্কা-মারা তো। পুলিশের নজরে পড়তে পারিস তোরা।

—তা ঠিক।

—চল্ দরগা রোড থেকে বাসে উঠব।

—কোথায় যাব ?

—পদ্মপুকুরের ওখানে পার্কের গায়ে দোকানটায় নিখুঁতি আর গরম লুচি খুব ভালো বানায়।

চাঁদচা সাইকেল নিয়ে আগেই রওনা হয়ে যায়। পদ্মপুকুর মোটামুটি ওদের এলাকা। নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া চলবে। কথাবার্তা খেয়ে-দেয়ে বাইরে এসে পার্কের ধারে একজায়গায় গিয়ে বললেই হবে।

বীরেনবাবু চলতে চলতে বলে—শুনলাম শেতল এর মধ্যেই ম্যাটাডোর ভাড়া করে ফেলেছে মর্গ থেকে লাশ নিয়ে আসার জন্য। তোরা বিশ্বাস

করবি না শেতলের কথায় বস্তির সবাই উঠছে আর বসছে। ডেড-বডি নিয়ে শেতল প্রসেশন বার করবে। সে সঙ্গে যাবে।

ঘোত্‌না বলে—সত্যি ? শুনেছি এককালে নাকি দারুণ ছিল।

সুখেন বলে—হাত দুটো দেখেছিস ? বস্তির এপার থেকে পেটো ছুঁড়লে নাকি ওপারে ফুলকপির ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে ফাটতো।

মানিক হাল্‌কা হাসি হেসে বলে—আমার বড়দি বলত শিবরাত্রির উপোসের পরে মেয়েরা নাকি ওর মাথায় জল দিতে চাইত।

শিবু চেঁচিয়ে ওঠে—থাম্। ইয়ার্কি হচ্ছে। তোরা অল্পেতে এত গলে যাস্ !

বীরেনবাবু ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটিতে নিশ্চিন্ত হয়।

সেদিন শিবুরা নিজের চোখেই দেখলো নেংড়া শেতল কতবড় মিছিল বার করল। এই বস্তির কয়েকজন বোমা খেয়ে আগেও মরেছে। কিন্তু মিছিল তো বার হয় নি। শুধু ওদের বস্তির নয়, আশেপাশের বস্তির লোকেরা শেতলকে ম্যাটাডোরের ওপর বসে থাকতে দেখে দলে দলে এসে যোগ দিল। এতদিন তারা সিঁটিয়ে থাকত। এখন খবর পেয়ে গিয়েছে কুম্ভকর্ণ জেগে উঠেছে। তাই প্রবীণেরা শ্লোগান দিতে দিতে এসে যোগ দিল। বড়বাবু কিছু পুলিশ নিয়ে মিছিলের সঙ্গে রয়েছে। শেতল সাফ জানিয়ে দিয়েছে মিছিলের ওপর দেঁতো কাশীরা হামলা করলে আগুন জ্বলবে।

রাস্তায় এক জায়গায় শিবুদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শেতল বলে—চলে আয় তোরা। কোন্ শালা তোদের গায়ে হাত দেয় দেখব। উঠে আয় ম্যাটাডোরে। শিবুরা উঠলো না। হাত নেড়ে ইসারায় জানিয়ে দেয় পরে যাবে শ্মশানে। শেতল কী ভেবে চুপ করে যায়।

শিব সুখেনদের ডেকে বলে—চল, আগে নিউটনের খোঁজ নিয়ে আসি। কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল দেখতে হবে। ও শালা আমাদের অর্জুন।

হাবু বলে ওঠে—আর আমি ভীম।

ঘোত্না কাষ্ঠহাসি হেসে বলে—তুই না, আমি ভীম। তুই ধেনো গিলে গিলে আর সেই আলপনা মেয়েটার পেছনে ঘুরে ঘুরে ইস্তিরি করা চাম চিকে হয়ে গিয়েছিস।

হাবু ঘুষি পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে মানিক তার কোমরে একটা খোঁচ দিয়ে বলে—চল।

সন্ধ্যা ছটা।

বড়বাবুর ঘরের ফোন বেজে ওঠে। একবার—তুবার—তিনবার। দূরের ঘরে বসে এ এস. আই শীল ডায়রী লিখতে লিখতে উস্‌খুস্ করে। শেষে মুখ বিকৃতি করে চেঁচিয়ে ওঠে—আরে দরওয়াজা কোথায় গেল? হেড কন্‌স্টেব্‌ল্ দারোগাপ্রসাদ বলে—মনে হলো, কানে পৈতো পেঁচাচ্ছিল।

শীল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে বলে—খেয়েছে। নিশ্চয় বাথরুমে ঢুকেছে। বলে যাবে তো।

দারোগাপ্রসাদ বলে—আপনি বৈঠেন। কাম করুন। আমি ফোন ধরছি। দারোগাপ্রসাদ ফোন তুলতেই বড় সাহেবের গলা ভেসে আসে। বড় সাহেব বড় বাবুর হদিস জানতে চায়।

দারোগাপ্রসাদ বলে—সাব, উনি তো ফিরে আসেন নাহ।

ওদিকে এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট কমিশনার দারোগার কথা শুনেহ ভীষণ চটে যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। ওপর থেকে হুকুম হয়েছে ন্যাটা হাবুর দলের সবাইকে এ্যারেস্ট করতে হবে। নেংড়া শেতলের হুমকিতে থমকে গেলে চলবে না। এদিকে এস বি খবর দিয়েছে ন্যাটা-হাবুর দলের প্রায় সবাইকেই দিলখুসা স্ট্রীটের বারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তারা শবযাত্রার মিছিল দেখেছে। শেতল তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তবু কেন তাদের এ্যারেস্ট করা হলো না এই কৈফিয়ৎ ওপর

থেকে চাইছে। অথচ ও সি. নেই।

এ. সি. বলে—বড়বাবু কখন আসবেন ?

—হোজুর, উনি তো জোলুসের সঙ্গে আছেন।

—সেকেণ্ড অফিসার কোথায় ?

ঠিক সেই মুহূর্তে বড়বাবু শেতলের মিছিলকে পরবর্তী থানার ও. সি. র-হাতে দিয়ে ঘামতে ঘামতে এসে ঘরে ঢুকে বলে—কার ফোন ?

বড়াসাব্।

ও. সি ফোনটি নিয়ে বলে—হ্যালো স্যার। আমি এইমাত্র ফিরছি।

ওদিক থেকে ফোনের ভেতরে কিছুক্ষণ লম্ফঝম্প হলো। ও. সি. গরম শরীরে অথচ ঠাণ্ডা মাথায় সবটুকু শুনে নিয়ে বলে—শুনুন স্যার। আমার এলাকায় আমি এখন কোনো ঝঞ্ঝাট বাধাতে চাই না। দেঁতো কাশী আমার এলাকার নয়। তাদের দুএকজনকে অন্তত যদি আপনি তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে পারেন, আমি শিবুদের গোটা দলকে তুলে নিচ্ছি।

ওদিক থেকে ফোনে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—এসব আপনার এলাকা, তার এলাকার ব্যাপার নয়। এটা হলো পলিসি। আপনাকে সেই পলিসি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। হাবুর দলকে হাজতে ভরতে হবে।

—আর দেঁতোর দল ?

বললাম তো, সে ব্যাপারে কোনো ডাইরেকশান নেই।

—কিন্তু স্যার, ডি. সি. নিজে কথা দিয়েছেন দেঁতোদের ব্যবস্থা করা হবে শুধু তখনি শেতলরা লাশ ছেড়ে দিতে রাজী হয়। শেতলকে তো আপনি চেনেন বলে শুনেছি।

বড়সাহেব বলে—ওসব ছেড়ে দিন তো। কত লোককে কত কথা দিতে হয়। কিন্তু সবার আগে চাকরী।

ও. সি চুপ করে থাকে।

বড়সাহেব আবার বলে—শুনুন। আপনি ও. সি. হয়েও ভুলে যাচ্ছেন যে ডিসিপ্লিন্‌ড্‌ ফোর্সে কাজ করেন। যা আপনাকে বলছি সেটাই অর্ডার।

—ও. কে. স্যার। চেষ্টা করছি।

বড়সাহেব ফোন নামিয়ে রাখতেই ও. সিও ধপ্‌ করে সেটা ছেড়ে দেয়। সারাদিন খেটেখুটেও শান্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন আবার বেজে ওঠে। আবার বড়সাহেব। ও প্রান্ত থেকে বলে—বলতে ভুলে গিয়েছি। এস বি-র রিপোর্ট হলো, হাবুর দল দিল-খুশা স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেছিল।

—তাই নাকি! থাকতে পারে। আমি পেছনে ছিলাম। আমাকে দেখে হয়ত সরে পড়েছিল। আমার লক্ষ্য ছিল দেঁতো কাশীর দল যাতে হামলা না করে।

—ধুৎ মশায়, খালি দেঁতো কাশী, দেঁতো কাশী। ও তো আপনার এলাকার নয়। অত মাথা ঘামাবেন না।

—ঠিক আছে।

—হ্যাঁ। হাবুর দলের দুএকজনের নাম বলুন তো? নতুন ডি. সি. ভাবেন সবই আমার নখদর্পণে। কী যে ফ্যাসাদ।

—একজনকে জানি ঘোতনা, আর একজন সুখেন। পরে বলব। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

—চার পাঁচ মাস তো হয়ে গেল এই থানায়। নামগুলো এবারে মুখস্থ করে ফেলুন। আমি যখন ও সি. ছিলাম আমাদের ডি. সি. তখন ছিলেন ব্যানার্জী সাহেব। তিনি ডিপার্টমেণ্টাল। তিনি বলতেন, প্রত্যেক এ্যান্টি-সোশ্যালের নাম, বাপের নাম, লেখাপড়া কতদূর, কী নেশা করে, হবি কি ইত্যাদি যাবতীয় মুখস্থ রাখতে হয়। তা ভগবানের কৃপায় আমি রাখতাম। থানার সিপাইদের প্রত্যেকের ঘরের খবর জানতাম। ফোর্সে ডিসিপ্লিন কি এমনিতেই রাখা যায় মশায়?

ও. সি. অতিষ্ঠ হয়ে বলে—ঠিক বলেছেন স্যার।

—আমি ঘণ্টাখানেক পরে ফোন করব।

বড়সাহেব ফোন ছেড়ে দিতেই ও সি. মুখখানাকে বিকৃত করে। সে খেয়াল করে নি দারোগাপ্রসাদ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি মুখখানাকে স্বাভাবিক করে।

দারোগাপ্রসাদ নামকরা কুস্তিগীর ছিল এককালে। অলিম্পিকে যেতে যেতে যাওয়া হয় নি ক্লিক-এর জন্য। এখন বয়স হলেও কুস্তী ছাড়ে নি। সে ও সি.র মুখভঙ্গী দেখেও না দেখার ভান করে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। ও সির ওপর তার এক বিশেষ অধিকার রয়েছে, যেমন ও সিরও তার ওপর রয়েছে। সে যখন কন্‌স্টেবল, তখন ও সি ছিল সাবইন্‌স্‌পেক্টর। তাকে ও সির ভালো লেগে যায়। ফলে যেখানেই বদলী হয়েছে নিজে, সেখানেই কাঠখড় পুড়িয়ে দারোগাপ্রসাদকে নিয়ে গিয়েছে। বদলী করে না হোক, অন্তত ডেপুটেশানে। থানা স্পেশাল হবার লোভ কোনোদিন তার ছিল না। এখন তো উঁচুপোস্টে বলে প্রশ্নই ওঠে না। পয়সার ওপর অহেতুক কোনো লালসা নেই। দেশে জমিও কিনতে চায় না, মন্দিরও বানাতে চায় না। কুস্তীও তাই ধ্যান জ্ঞান ইহকাল এবং যদি সম্ভব হতো পরকালও। শরীরটার ওপর তার বড্ড মায়া।

—কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—একঠো চিঠি লিখিয়ে দিতে হোবে।

—যা যা, পালা। নিজের জ্বালায় বাঁচছি না। চিঠি লিখে দিতে হবে। হবে। যত সব আবদার।

—হাঁ হোজুর তা বলতে পারেন।

—কী—।

—আবদার।

—তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই? দেখছিস না এলাকায় অশান্তি, ওপর থেকে ধাতানি খাচ্ছি?

—ওসব তো থাকবেই হোজুর। আমার হোজুরের ওতে মাথা গরম হয় না।

—খুব তেল দেওয়া শিখেছিস। কিসের চিঠি। কোথাও দরখাস্ত করবি নাকি বদলির জন্যে?

—আরে এ কি বোলতেছিল। আমার ফেরেণ্ডকে লিখব।

ও সি একটু অবাক হয়—ফেরেণ্ড? তোর বন্ধু তুই নিজে লেখগে। আমি কেন?

—ইংরাজীতে লিখতে হোবে যে।

—অ্যাঁ।

—হাঁ বাবু। আপনার মনে নেই? আমার সেই জারমানির ফেরেণ্ড। সে তার ফ্যামিলির ছবি পাঠিয়েছে। আমাকেও ছবি পাঠাতে বলিয়েছে। আমি একখানা ছবি তুলিয়েছি।

মনে পড়ছে বটে। ট্রাফিকে যখন দারোগাপ্রসাদ তখন এক জার্মান টুরিস্ট ডোরিনা ক্রশিং-এ ট্রাফিক সিগন্যাল দেওয়া দেখে আর ওর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে মুগ্ধ হয়। পরে ওর সঙ্গে ভাব করে বটে। কিন্তু সেই ভাব এখনো চলছে? সে তো বারো-চোদ্দ বছর আগের কথা।

—তোর সেই জার্মান বন্ধু এখনো চিঠি দেয়?

—হাঁ, হোজুর।

—তুই উত্তর দিস?

—হাঁ, জরুর।

—কে লিখে দেয়?

দারোগাপ্রসাদ লজ্জিত হয়ে বলে—লিখিয়ে নি। আপনি ব্যস্ত থাকেন। শুধু গালাগালি দেন।

—চুপ কর মিথ্যেবাদী। দেখি তোর ফ্রেণ্ড কোন্ ছবি পাঠিয়েছে?

ছবি সব সময় সঙ্গে করে নিয়ে ঘোরে দারোগা। নইলে সবাইকে দেখানো যায় না। সবাই অবাক হয়ে যায়। সুতরাং বুক পকেট থেকে রঙিন ছবি

বার করে ও সি.র হাতে দেয়। সুন্দর ছবি। ভদ্রলোকের নিজের একটি ছোট কটেজ। সামনে একটু বাগান। সেখানে স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের বছর দশেকের ছেলেটি একটা 'বাই সাইকেল ধরে হাসছে।

—বাঃ সুন্দর ছবি তো। তুই তোর ফ্যামিলির ছবি পাঠাবি না!

—আমার ফেমিলি তো দেশে আছে। আমি আমার একখানা তুলিয়েছি।

—কই দেখি দেখি?

দারোগাপ্রসাদ অতি যত্নে তার ছবিখানা বার করে ও সি র হাতে দেয়। ছবি দেখে ও সি আৎকে ওঠে। ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিক এ্যাক্টে ধরা না পড়ে। স্রেফ্ একটা ল্যাঙট্ পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দারোগা প্রসাদ।

—একি করেছিস? তোর লজ্জা করে না?

—কেন? লজ্জা কেন? আমি কুস্তী লড়ি। ফেরেণ্ড খুব পছন্দ করবে। সাহেব আমার কুস্তী দেখিয়েছে।

—ভালো। ঠিক আছে। কাল চিঠি লিখে দেবো। এখন যা তো রামশরণকে ডেকে দে।

থানা স্পেশাল রামশরণের কাছ থেকে কিছু নাম না জেনে রাখলে বড়-সাহেব জ্বালাতন করবে।

দারোগাপ্রসাদের ট্রাফিক কণ্ট্রোলের কথা এখনো ও. সি.র চোখের সামনে ভাসে। সত্যিই দেখবার মতো ছিল। এখন আর ওসব দেখা যায় না। সব ব্যাপারেই একটা ঢিলেঢালা ভাব এসে গিয়েছে। নিজের কথা ভাবে ও সি। নিজে সে থানার বড়বাবু! কিন্তু সে যখন পুলিশে ঢুকেছিল তখনকার বড়বাবুদের চেহারাগুলো কী মনে পড়ে। কী তাদের প্রতাপ। কী ব্যক্তিত্ব। এখন পাড়ার কোনো রাজনৈতিক নেতার চামচা এলে 'আসুন-বসুন' বলে কূল পাওয়া যায় না। আর তখন উঁচুদরের নেতারাও যদি কালেভদ্রে কখনো আসতেন তাঁদের সঙ্গে বড়বাবুর ব্যবহার ছিল অতি স্বাভাবিক। কীসের যেন একটা জোর ছিল। বোধহয় নীতির। যে

নীতি রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সবাই লঙ্ঘন করতে দ্বিধা বোধ করত। সেই নীতি একেবারে আলগা হয়ে গিয়েছে। তাই সবার মাজার জোর কমে গিয়েছে।

রামশরণ ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে ফোনও বেজে ওঠে। তাকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে বড়বাবু বলে—হ্যালো।

যা ভেবেছে ঠিক তাই। বড়সাহেবের গলা—নামগুলো পেয়েছেন?

—একটু ধরুন স্যার।

ফোনে হাত চাপা দিয়েরামশরণকে ও. সি. বলে—হাবুর দলের নামগুলো বল তো চট্‌পট্। এ সি. জানতে চাইছেন।

—ঘোতনা, সুখেন—

—জানি, তারপর?

—শিবু, মানিক, নিউটন। শুনলাম নিউটন চোট পেয়েছে।

ও সি. বড় সাহেবকে নামগুলো বলে দিয়ে একটু বাহাদুরি নিতে গিয়ে বলে—স্যার শুনলাম এদের মধ্যে নিউটন নাকি ইন্‌জিওরড়।

ওধার থেকে—হাসপাতালে দিয়েছে নাকি?

—এখনো চেক্ করা হয় নি।

—তবে আর ও. সি. হয়েছেন কেন? এগুলো দেখতে হবে তো।

ও. সি.র মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে শক্ত কণ্ঠে বলে—এই তো ফিরলাম। এখন লোক পাঠাব।

কত প্রবীণ অফিসারের কাছে শুনেছে, পুলিশে আগ বাড়িয়ে বাহাদুরি নেবার জন্য সুপিরিয়ার অফিসারদের কখনো কিছু বলতে নেই। ফেঁসে যেতে হয়। তবু জ্ঞান হলো না।

—পাঠাবেন? এখনো পাঠান নি!

ও সি. পাল্টা প্রশ্ন করে—কেওড়াতলার খবর কি স্যার? মিছিল ওখানে পৌঁছেচে? আমি তো গড়িয়াহাটের ও. সিকে হ্যাণ্ডওভার করে বলে এসেছি। সব ঠিক আছে তো?

—খবর পাইনি। ঠিক না থাকলে খবর আসত। অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ওটা আপনারও এরিয়া না, আমারও নয়।

—কিন্তু কেওড়াতলায় যদি দু'দল ঝামেলা করে তার জের আমাদের সামলাতে হবে। তখন টালিগঞ্জের ও সি. এসে সামলাবে না।

—আপনি চলে এলেন কেন তবে?

—কণ্ট্রোলরুম থেকে আমাকে ডাইরেক্ট করা হয়েছে ফিরে আসতে।

—হুঁ। আপনার সেকেণ্ড অফিসার কোথায়?

—পেট্রল করছে হাবুদের এলাকা। আপনি স্যার দুটো পিকেটের কথা বলেছেন তো ডি সি. কে?

—পিকেট? কণ্ট্রোল বলেছে থানাকে ম্যানেজ করতে হবে। প্রাইম মিনিস্টার আসছেন দুদিন পর। হেড কোয়ার্টার্স থেকে আপাতত পাওয়া যাবে না। কদিন পরে আবার রাষ্ট্রপতিও আসছেন।

—আপনি একটু ইনসিস্ট করলে ভালো হতো। থানায় ফোর্সই নেই। পি এম-এর জন্যে আমার ফোর্সও টেনেছে।

—আরে, আমি যা করার করছি। যা বললাম করে ফেলুন তো আগে। ও সি সোজা ডি সি কে বলতে পারত ফোর্সের ব্যাপারে। সেটা উচিত হতো না। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার একটা রেওয়াজ চালু হলেও সে ডিসিপ্লিন মেনেই চলতে চায়। এতে অনেক অসুবিধা। কারণ সবাই নিজের চাকরী বাঁচাতে ব্যস্ত। চাকরী বাঁচিয়ে প্রমোশন পেতে হলে আসল কাজ না করে ওপরওয়ালাকে কাজের চটক দেখালে সুবিধা হয় বেশী।

বড়সাহেব জিজ্ঞাসা করে—আপনার ডিউটি অফিসার এখন কে?

—বর্মন।

—সে কোথায় গেল?

—এসেই শুনলাম, একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বাসের সঙ্গে ঠেলাগাড়ির সেখানে গিয়েছে।

—লোক মরেছে ?

—কিছুই জানি না। খবরটা আসে কণ্ট্রোলরুম থেকে।

—আবার এ্যাকসিডেন্ট হতে গেল কেন ? নিউটনের খোঁজ নিতে হাস-পাতালে কাকে পাঠাচ্ছেন ?

—দারোগাপ্রসাদ যাচ্ছে।

—আপনার সেই পোষ্যপুত্র !

—এবারে সে গভর্নরস্ মেডেল পেয়েছে স্যার ডি সি র রেকমেণ্ডেশানে। আমি বলিনি। ওর সার্ভিস রেকর্ড দেখেই সাইটেশান্ পাঠানো হয়েছিল। বড়সাহেব সবটা না শুনেই ফোন ছেড়ে দেয়।

স্পেশাল রামশরণ অতি চালাক। বড়বাবুর মুখের রেখায় পরিবর্তন দেখেই কতকগুলো ব্যাপার আন্দাজ করে নেয়।

সে তাড়াতাড়ি বলে—দারোগাজীকে ডেকে দেবো স্যার ?

—হ্যাঁ, ডেকে দে। আর তুই হাবুদের বস্তিতে চলে যা। ওদের কেউ ফিরে এলে আমাকে জানাবি। কাউকে কিছু বলবি না। ফিরে এলেও না। বড়সাহেব যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও না।

—বহুৎ আচ্ছা সাব।

চন্দ্রমিস্ত্রির ঘরের খান পাঁচেক টালি উড়ে গিয়েছিল কাল ভোরের বোমা-বাজীতে। তাকে এই টালি সংগ্রহের জন্য বার হতে হবে। মেজাজ তাতে বিগড়ে ছিল মিস্ত্রির। তার ওপর কাল গুটি গুটি শেতলের পাশে গিয়ে যখন দাঁড়ালো চন্দনা, তখন তাকে লাগছিল যেন ছাদনা-তলার লাজে-মরা নববধূ। মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে গিয়েছে। রাতে বউ-এর উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে সারারাত মনে মনে ছট্‌ফট্ করেছে। তবু মরাকাঠের মতো পড়ে ছিল। যাতে চন্দনা বুঝতে না পারে। আর চন্দনা ? একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ। চন্দ্রমিস্ত্রি শুনেছে মাঝে-

মাঝে তার দীর্ঘশ্বাস। যেন সীতাকে ফেলে রেখেই রাম বনবাসে গিয়েছেন। ঈর্ষার আগুন জ্বলে দাউ-দাউ করে মাথার মধ্যে। ইস্, একটা যদি ছেলে কিংবা মেয়েও থাকত তাদের তবু সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যেত। কিছুই হলো না। মেয়েরা সতীসাধ্বী না হলে কি ছেলেপুলে হয়? সে তো সোহাগ করার কত চেষ্টা করেছে। চন্দনা কেমন আনমনা থাকে। শেতল ব্যাটার কথা ভাবে নিশ্চয়।

ভোর হতে না হতেই চন্দনার সঙ্গে বিনা কারণে খিটিমিটি বাধে। তারপর সূর্যের রঙ সাদা হতে না হতে বাইরে বের হয়ে আলতাফের দোকানে চা খেতে গিয়ে আর এক ধাক্কা। সেখানে শেতলকে ঘিরে বসে রয়েছে আট দশজন মানুষ। কালকের মিছিলের কথা ফলাও করে আলোচনা হচ্ছে। তা মিছিল ভালোই বার করেছিল শেতল। বীরেনবাবু তার নিজের প্রাইভেট দিয়েছিল। আরও একটা গাড়ি যোগাড় করে দিয়েছিল শেষের দিকে। মনে হচ্ছিল মস্ত এক নেতার বুঝি মৃত্যু হয়েছে। ন্যাটা-হাবুর দেহ ফুলের মালায় ঢেকে গিয়েছিল। দেখে হাবুর মায়ের চোখ সার্থক হয়েছে। কিছুটা সান্ত্বনা পেল।

শেতলকে বীরেনবাবু খুব তোয়াজ করেছে। সব বোঝে শেতল। এই চায়ের দোকানের আলতাফ। এখন তো দাড়ি পেকে প্রায় সাদা। আজ ডেকে এনে বসিয়েছে তাকে। বিনে পয়সার এক ভাঁড় চা নিজের হাতে এগিয়ে দিয়েছে মালাই সমেত। অথচ এই আলতাফই একদিন তাকে তাচ্ছিল্য করেছে—ঘৃণা করেছে। সবই কপাল। তাই বলে আলতাফকে সে দোষ দিচ্ছে না। দোষ তার নিজের। ভগবান সুযোগ দিয়েছিলেন, সে হেলায় সেটা হারিয়েছিল।

চন্দ্রমিস্ত্রি শেতলকে দেখেই পুলিশি ঢং-এ ঘুরে যেতেই আলতাফ ডেকে ওঠে—আরে মিস্ত্রি সাহেব চললেন কোথায়? আসুন, আপনার টালির চালা নিয়ে কথা হচ্ছিল। শীতলবাবু ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

শেতল নিজের গরজেই বলে—হ্যাঁ। আমি বীরেনবাবুকে কাল শ্মশানেই

বলেছি। উনি আজ টালি এনে দেবেন। তুমি তো নিজেই মেরামত করে নিতে পারবে—তাই না চন্দর?

বহুদিন পরে নেংড়া শেতল তার সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু সে স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিতে পারল না। শুধু ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাকিয়ে স্বীকৃতি জানালো।

বস্তির একজন মন্তব্য করল—শেতলদার ক্ষমতা আছে। এত কিছুর মধ্যেও চন্দরদার টালির কথা ঠিক মনে ছিল। একেই বলে নেতা।

কে যেন খুক্‌খুক্ করে একটু হেসে উঠল।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে চন্দ্রমিস্ত্রির ভেতরটা। হাসবেই তো। চন্দনার ঘরের টালি না হয়ে অন্যের ঘরের টালি হলে নেংড়াটা কখনই কিছু বলত না। রীতিমত অপমান। অথচ হাতের কাছে টালি এসে যাচ্ছে নিখরচায়। ফিরিয়ে দেওয়া বোকামি। চন্দ্রমিস্ত্রি ছুঁচো গেলার মতো চুপ করে থাকে। একজন বলে—শেতলদা, তুমি শিবু ঘোত্‌নাদের যে ভাবে ফিরিয়ে আনলে, আমরা ভাবতেই পারিনি।

শেতল কোনো উত্তর দেয় না। জানে, শিবুরা ফিরে এলেও তারা মোটেই নিরাপদ নয়। তাই ওদের বলে দিয়েছে একজন করে অন্তত কাউকে আলতাফের দোকানে বসিয়ে রাখে যেন। কিংবা আলতাফকেও বলে রাখতে পারে থানা স্পেশাল রামশরণ কিংবা অন্য কেউ এলে শিবুদের সম্বন্ধে কোনো খবর যেন না জানায়। সবচেয়ে বড় কথা রাতের বেলা যদি কখনো পুলিশ রেড হয় কখনো যেন পেছনের দিক দিয়ে পালাতে চেষ্টা না করে। গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা তাতে। তখন তারা শেতলের ঘরে গিয়ে যেন জড়ো হয়।

ওদিকে সতীশ ড্রাইভারের মেয়ে অপর্ণা রান্নাঘরের পাশে নধর মানকচু গাছের গোড়ায় এক কড়াই ছাই ঢেলে দিয়ে গাছটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বেশ কয়েকমাস হয়ে গেল, শিবুর তখন থেকেই নিশ্চয় তার ওপর নজর ছিল, একদিন এই মানকচু গাছটা কোথা

থেকে এনে অপর্ণার হাতে দিয়েছিল। তাই গাছটার দিকে চাইলে শিবুর কথা মনে পড়ে। অথৈ দীঘির জলের নীচে পাথরের বেদীর মধ্যে একটা বড় কৌটো, তার মধ্যে আর একটা কৌটো—তার ভেতরে রয়েছে প্রাণ-ভোমরা। মানগাছটা যেন শিবুর প্রাণ। সতীশ ড্রাইভার একবার এর গোড়ায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, ভালোই বড় হয়েছে, কেটে খেয়ে ফেললে হয়। অপর্ণা কেঁদে ফেলেছিল। গাছটা যে তার একথা বস্তির সবাই জানে।

তেরচা ভাবে এককলি সকালের রোদ অপর্ণার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। মুখের সেই অংশটা গরম গরম লাগছিল। শিব তাকে হঠাৎ একদিন স্পর্শ করে ফেলেছিল আচমকা, সেদিন সারা গা অমন গরম গরম লেগেছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অপর্ণা। কোথায় আছে শিবু কে জানে? এভাবে ঘুরলে তার পরিণতিও যদি হাবুর মতো হয়? সুযোগ সুবিধামতো নির্জনে দেখা হলে অপর্ণা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, এসব ছেড়ে দিতে। সে কথা বললেই, শিবুর ওই সপ্রতিভ মুখ কেমন বোকার মতো হয়ে যায়। সে হাসে, তবু কথা দেয় না সে এসব ছেড়ে দেবে। তবু অপর্ণার বিশ্বাস একদিন সে সবার মতো হবে।

অপর্ণার কাছ থেকে এই সময় শিবুর দূরত্ব কিন্তু খুব বেশী ছিল না! বড়জোর ছয় সাত মিটার। করালীর যে পিসি কদিন আগে মারা গেল, তার ঘরে শিবু রাত কাটিয়েছে। আর সেই ঘর সতীশ ড্রাইভারের ঘরের একেবারে লাগোয়া। ওই ঘরখানার দিকে তাকিয়ে সন্ধে হলেই অপর্ণার গা ছমছম করে। যদি করালীর পিসি হঠাৎ সামনে এসে বলে—ও অপর্ণা, তুই কি করছিস?

শিবু দেখল—অপর্ণা মানকচু গাছের গোড়ায় কড়াই উপুড় করে ছাই ঢাললো। দেখল, সে গাছটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। দেখল এক-ফালি সূর্যের রঙীন আলো অপর্ণার কপোল রাঙিয়ে দিলো। ঠিক যেন রঙিন রশ্মি এসে একটি গোলাপ ফুলের ওপর পড়েছে। শিবুর খুব লোভ

হলো। অপর্ণার রূপ ফুটে উঠেছে। গতকাল সিনেমায় যাবার কথা ছিল দুজনার। টিকিট দুটো চারদিন আগে কেনা। এখনো হিপ পকেটে রয়েছে।

ফিরে আসছিল অপর্ণা মানকচু গাছের গোড়া থেকে। আর সেই সময় শিবু টুক্ করে আস্তে ডাকে—এই অপর্ণা।

হাতের কড়াই ঝনাৎ করে পড়ে যায় অপর্ণার। রান্নাঘর থেকে মা তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে ওঠে—যত ধুমসী হচ্ছিস তত অকম্মার ঢেঁকী হচ্ছিস। দুদিন পরে অন্যের ঘরে গেলে মজা বুঝবি।

মায়ের চীৎকার কানে যায় না অপর্ণার, ততক্ষণ সে করালীর পিসির দরজার ফাঁকে পিসির নয়, শিবুর মুখ দেখতে পেয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে। আর শিবুর আদর শুরু হয়ে যায়—আমার অপর্ণা রাগ করেছে। কাল সিনেমায় নিয়ে যেতে পারিনি। আমার অপর্ণা কী লক্ষ্মী। এমন লক্ষ্মী মেয়ে পৃথিবীতে আর একটাও নেই।

প্রথমটা বিহবল হয়ে পড়লেও, কিছুক্ষণের মধ্যে পারিপার্শ্বিক সব কিছু মনে পড়ে যায় অপর্ণার। সে তাড়াতাড়ি একটু সরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—এই ছাড়ো, কি হচ্ছে। দেখে ফেলবে।

শিবু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়। আবেগের বশে সে একটু বেশী মাত্রায় এগিয়েছিল। এতটা আর কখনো করেনি। করার চিন্তাও মাথার মধ্যে স্থান পায় নি। বোধহয় নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একধরনের অনিশ্চয়তা তাকে এতটা বেপরোয়া করে তুলেছিল।

অপর্ণা আস্তে আস্তে বলে—ভূতের ভয় নেই?

—আমিই তো ভূত। অন্য ভূত মানি না।

—আমি চললাম। পরে—

—আজ রাতেও এখানে থাকব।

—আচ্ছা।

সেই সময় অন্ধকার ঘরের এক কোণা থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কে যেন বলে ওঠে—যা বাবা। আজ রাতে আবার অন্য জায়গায় আস্তানা খুঁজতে হবে দেখছি।

করালীর পিসির রান্নার জায়গাটুকু একই ঘরের ভেতরে ইঁট দিয়ে উঁচু করে আলাদা করা। সেখান থেকে ভেসে আসে কণ্ঠস্বর।

শিবু যতটা চমকায়, তার চেয়েও অপর্ণার অবস্থা আরও খারাপ। তার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে যায়। এমনকি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সে স্খলিত পদে ছুটে পালায়।

শিবু মানুষটার গলা চিনতে পারে না।

সেই সময় আবার একটা গলার আওয়াজ শোনা যায়—কী হলো। ভালবাসার ইড্‌লী পালালো ?

এবারে হারুর গলার স্বব চিনে ফেলেছে শিবু। ছুটে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—শালা।

—গালাগালি দিচ্ছিস কেন ? আমি কি করলাম ?

—তুই শালা সারারাত এ ঘরে ছিলিস, বলিস নি কেন আমাকে ?

—আমি অপেক্ষা করছিলাম। তাই রাত্তিরে ঘাপ্‌টি মেরে ছিলাম।

—কিসের অপেক্ষা করছিলিস্ !

—যা দেখলাম। ঠিক জানতাম তা হবেই। ঠিক যেন মাইরি ইংরিজি সিনেমা। কিন্তু ওসব দেখে আমার লাভটা কি ? বুকের ভেতরে হু হু করছে আরও। আমার আলপনা। কোথায় তুমি। আর কি জীবনে তোমায় পাব ?

—চুপ কর। নিউটনের খবর কি ? ওর আঙুল কেমন ?

—খুব ভালো। ক্যাবলার মতো হাসছিল কালকে।

—তুই এই ঘরে থাকবি বলিস নি তো ?

—আগে ভেবেছিলাম বাইরে কোথাও থাকব।

—না থেকে ভালোই করেছিস্। নেংড়া শেতল দারুণ, তাই না ?

—ও বলেছে, পুলিশের বাপের ক্ষমতা নেই এ বস্তিতে চড়াও হয়। বিশ্বাস হয় না।

ওদিকের একটা ঘর থেকে ন্যাটা হাবুর মায়ের চাপা কান্নার আওয়াজ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। শিবু আর হারু ঘর থেকে বার হয়ে সেদিকে যায়। হাবুদের ঘরের চালায় একটা নধর পুঁইশাকের গাছ উঠে গিয়েছে। ফল পেকে কালচে রঙ ধরেছে। ওই ফল টিপলে বেগুনে রঙ বার হয়। হাবু পুঁইশাক খেতে খুব ভালবাসত। লাইনের ধারের বাজার থেকে মাছের পিত্তি যোগাড় করে নিয়ে এসে পুঁইগাছের গোড়ায় দিত। ওতে নাকি সার হয়।

শিবুরা ঘরে ঢুকতেই হাবুর মা ডুকরে কেঁদে ওঠে—ওরে শিবু, তোরা আমার হাবুকে ফিরিয়ে এনে দে। আমি ওকে নিয়ে চলে যাব।

—মাসীমা।

—না, না। আমি কারও মাসীমা না। আমি হাবুর মা। তোরা আমার হাবুকে এনে দে। কোথায় রেখে এলি ওকে।

হারু ফস্ করে বলে ফেলে—আমরা ওকে আনব কি করে? আমরাই ওর কাছে চলে যাব মাসীমা।

—কী সব্বোনেশে কথা বলছিস্ রে তুই।

—ঠিক বলছি। আপনি চুপ করুন। হাবুদা আমাদের নেতা ছিল। আমাদের একজনও বেঁচে থাকলে হাবুদার মা না খেয়ে থাকবে না।

—আমি ভাত চাই না। তোরা বরং আমাকে মেরে ফেল্।

এবারে শিবু বলে—মাসীমা, হাবু আমাদের নেতা ছিল। আপনি হবেন আমাদের মেয়েদের নেতা। মায়েদের কবে কাকে কাঁদতে হবে ঠিক নেই। আপনি গিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তারা শান্তি পাবে।

ন্যাটা-হাবুর মা কথার খেই হারিয়ে ফেলে শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে ঘোতনার মায়ের ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত। টাকা ছিল না বলে

গতবারের রেশনে শুধু গমটুকু তুলতে পেরেছে। ঘোত্না বলেছিল কিছু টাকা সে দেবে। দিত হয়ত। হঠাৎ কালকের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সব তছনচ হয়ে গিয়েছে। রাতে একবার ঘরে এসেছিল সে। চাল নেই শুনে হাত থেকে ঘড়িটা খুলে মাকে দিয়ে বলেছিল—এটা বেচে কিনে নিস্।

—ক'টাকায় বেচব ?

—যা পাস নিয়ে নিস।

—সেকি রে, ঘড়ির দাম নেই ? দেখে মনে হয়, অনেক দাম।

—তোর অত কথায় দরকার কি ? যা পাবি নিয়ে নিবি। বলবি ভালো ঘড়ি।

—তোর ঘড়ি শুনলে কেউ কিনবে না।

ঘোত্নার রাতজাগা চোখ আরও লাল দেখায় কথাটা শুনে। শেষে হেসে বলে—বন্ধক দে। বলবি, দুদিন পরে ছাড়িয়ে নিবি। তিন চার-দিনের চাল যাতে কিনতে পারিস।

ঘোত্না ঘর থেকে বার হয়ে যায়। তার মা অনেকক্ষণ ধরে মাটির মেঝের ওপর ঠায় বসে ভাবে। শেষে গুটিগুটি জালাল শেখের ঘরের দিকে রওনা হয়। জালাল চামড়ার ব্যবসা করে। ওর হাতে সব সময় টাকা থাকে।

জালালের অন্দরের সামনে একটা চটের পর্দা ঝোলে। শতচ্ছিন্ন হলেও কিছুটা আব্রু রক্ষা হয়। ঘোত্নার মা নীচু গলায় ডাকে—জুলেখা, আছিস নাকি রে ?

—কে ?

—আমি ঘোত্নার মা।

জালালের বিবি বার হয়ে এসে শুধোয়—কি হলো ? ঘোত্না ফিরেছে ?

—তা ফিরেছিল একটু আগে। আবার বার হয়ে গেল। আমি একটা দরকারে এসেছিলাম।

জুলেখা জানে, তার কাছে কী দরকারে আসে সাধারণত বস্তিবাসীরা।

অন্যদিন হলে মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে রাখত। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর সেটা পারে না। ঘোত্‌নাদের ওপর এমনিতে তার ভীষণ রাগ। কিন্তু বস্তিবাসীরা বিপদে পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে না।

সে বলে—কি দরকার বল।

ঘোত্‌নার মা আঁচলের নীচে থেকে ঘড়িটা বার করে দেখিয়ে বলে—এটা ঘোত্‌নার। ঘরে চাল নেই। রেশানে গম তুলেছিলাম শুধু। ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই এটা রেখে যদি কিছু টাকা দিতিস্। দুচার কিলো চাল কিনতাম।

জুলেখা বলে—ও ঘড়ি আমি রাখব না। তোমার জামাই খুব রাগ করবে।

ঘোত্‌নার মা বুঝতে পারে, কেন রাখতে চাইছে না জুলেখা। জুলেখার দোষ কি? মা হয়ে নিজেও তো বুঝতে পারে, কীভাবে এসব ঘড়ি আসে। তাই মুহূর্তের জন্য তার মতো ডাকসাইটে মেয়ে মানুষকেও ম্রিয়মাণ দেখায়।

সে মিন্‌মিন্‌ করে বলে—তাহলে? কোথায় যাব তাই ভাবছি। দেখি—ঘোত্‌নার মা ঘড়িটা আচলের তলায় লুকিয়ে ফিরতেই জুলেখা ডাকে। বলে—আমার কাছে টাকা আছে। দুকিলো চাল হয়ে যাবে। তুমি ঘোত্‌নাকে বলো পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে যেন শোধ করে দেয়। ঘড়ি তুমি নিয়ে যাও।

হাতে স্বর্গ পায় ঘোত্‌নার মা। সে বলে—ঠিক আছে। তাই দে। তোর ভালো হবে। শেখ সাহেব নিজে খেটে পয়সা কামায়। তার কি খারাপ হতে পারে?

জুলেখা ভাবে পোড়াপেটে তো একজনও এলো না। ঘর খাঁ-খাঁ করে। কী বা ভালো হচ্ছে? শেখ সাহেব বলে তার দোষ। কিন্তু সে তো শুনেছে ডাক্তাররা বলে ছেলেদের দোষেও এমন হয়। মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপানো বরাবর চলে আসছে।

জুলেখার হাত থেকে টাকা কয়টা নিয়ে মনমরা হয়ে ঘোত্‌নার মা ঘরে ফেরে। আগে কখনো কারো কাছে এভাবে সে হাত পাতেনি। তার ঘোত্‌নাও জালাল শেখের মতো হতে পারত। লেখাপড়া কয়জন শিখতে পারে এই বস্তিতে? তাছাড়া ঘোত্‌নার মাথাটাও নাকি মোটা। কিন্তু সে খাটতে পারত গীতার ছেলের মতো। গীতা তো ব্রিজের ওপারে লোকের বাড়িতে বাসন মেজে সংসার চালায়। তার স্বামী বউ-এর পয়সায় মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। অথচ এর মধ্যেই তার ছেলে পল্টু দস্তানা তৈরীর কারখানায় ঢুকে পড়েছে। সপ্তাহে চল্লিশ টাকা করে পায়। মাকে তার থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিয়ে বলে—বাবাকে বলিস না। চুল্লু খেয়ে উড়িয়ে দেবে।

ঘোত্‌না তো পল্টুর মতোও হতে পারত। কী দরকার ছিল বড় হবার স্বপ্ন দেখার। তবে সম্মান আছে। সবাই সমীহ করে। ঘোত্‌নার মা হিসাবে তার খাতির কম নয়।

সকালে থানায় এসে বড়বাবু অনুভব করে একটা বিষাদের ছায়া যেন ছড়িয়ে পড়েছে সারা থানায়। ব্যাপারটা কি? লক্ষ্য করে, সেন্ট্রি তাকে দেখে এ্যাটেনশান হতে হয় বলেই হলো। এ এস আই. সামনে উপ-বিষ্ট পাবলিকের কাছ থেকে শুনে ডায়রী রোজকার মতো লিখলেও তেমন যেন উৎসাহ নেই। দরওয়াজা কোমরে এক গোছা চাবি ঝুলিয়ে তাকে দেখে স্মার্ট স্যালুট না দিয়ে বেতো রুগীর মতো হাত উঠিয়ে কপালে ছোঁয়ায়। হয়েছেটা কি? বহুদিন থানায় সাধারণ অফিসার এবং সেকেণ্ড অফিসার হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তাই উল্টো হাওয়া বইলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটা কিছু হয়েছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজের অফিস ঘরে বসেই বোতাম টেপে। থানায় সব সময় একজন কনস্টেবল থাকে। থানার লক-আপ অর্থাৎ হাজতের ভার থাকে তার ওপরে। কয়েদীদের বড়-বাইরে ছোট-বাইরে করানো

থেকে শুরু করে যাবতীয় ফাইফরমায়েস সে-ই খাটে। ইংরেজ আমলে তাকে বলা হতো 'দরওয়াজা', ইংরেজ চলে যাবার পর মাতৃভাষায় তাকে বলা হয় 'ডিউটি'। চার ঘণ্টা পর পর এদের পিরিবর্তন হয়।

বেল্ টিপতেই ডিউটি এসে স্যালুট করে দাঁড়ায়। সকালের সর্বপ্রথম স্যালুটটা এখনো একটু কড়াভাবেই দিতে চায় সবাই। হাজার হলেও থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এই বড় বাবুই। এই অভ্যাস বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে আগত পূর্বসুরীদের কাছ থেকে পাওয়া। সেই সব প্রদেশের কর্মচারী যদিও রয়েছে এখনো, তবু নিখাদ বঙ্গসন্তানদের গরিষ্ঠতা অনস্বীকার্য। তারা স্যালুট্ দেয় ভালোই। তবে পুরোনো এবং রিটায়ার্ড অফিসারদের মতে তাদের নাকের নীচে দর্শনধারী এক জোড়া পুরু গোছের গোঁফের অভাব স্যালুটকে বেশ কিছুটা নিস্প্রভ করে তোলে। অর্থাৎ পরিপূর্ণতার ঘাটতি থেকে যায়। তাছাড়া এখনকার পুলিশদের পেটকে বেষ্টন করে রাখে যে বেল্ট, তাতে বাড়তি ফুটো করতে হয় না। আগেকার দিনে বাড়তি ফুটো করার পরও বেল্ট কোমর থেকে ছিটকে যাবার মতো অবস্থায় থাকত। এখন বরং অনেক সময় বেল্টের নীচে জামা প্যান্টের অনেক ভাঁজ পড়ে কুঁচি দেওয়া বলে মনে হয়। আগেকার দিনে বিহার উত্তরপদেশ থেকে সংসারের উত্তাপটা সোজাসুজি সিপাহীদের গায়ে এসে লাগত না। তাছাড়া তারা আসত যে কোনো ভাবে হোক গ্রাসাচ্ছাদন এবং জমি ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য পয়সা উপায় করতে। তখন উচ্চাশার চূড়ার দিকে তাকিয়ে সন্তান প্রতিপালনের কল্পনা ছিল না কারও। অনুভূতিও ততটা ছিল কি? এখন রয়েছে এবং রীতিমত রয়েছে। একটু আগে যে কন্স্টেবল বড়বাবুর সামনে স্যালুট করে দাঁড়ালো, তার দুই ছেলে। তার আশা ছেলেদুটোকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলবে। তাই সংসারের গন্গনে আঁচে পেটে ভুঁড়ি জন্মাবার অবকাশ পায় না। বরং অনেকক্ষেত্রেই সন্তানদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বেশী সিরিয়াস হতে গিয়ে চোখ কোটরে ঢুকে যায়।

ফলে দারোগাপ্রসাদের মতো বুক টান্‌টান্‌ করে দাঁড়িয়ে সুন্দরভাবে ট্রাফিক সিগন্যাল দেবার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে অনেকের অজন্তা ধরনের দাঁড়াবার ভঙ্গী হয়ে যায়। এতে কারও দোষও নেই গুণও নেই। দেশটা যেরকম টালমাটাল অবস্থায় চলছে, তেমনি সবক্ষেত্রেই একটা সামঞ্জস্যহীনতার ছাপ। পুলিশ বিভাগই বা ব্যতিক্রম হবে কেন। পুলিশ তো আর শিবের ত্রিশূলের ওপর অবস্থান করে না।

বড়বাবু ডিউটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ! লোকটা দাড়ি কামায় নি। ইচ্ছে করলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে পারত। জ্বলে ওঠার অধিকার আছে। কারণ এই বিভাগটা নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা। তাছাড়া এক র‍্যাংক নীচের কেউ হলেও যে কোনো অফিসারকে ওপরের অফি-সারের যথেচ্ছভাবে ডেঁটে দেবার একটা ধারা ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছিল। সেটা এখন স্তিমিত। এখন প্রতিটি ব্যক্তিতে মানুষ হিসাবে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দেবার চেষ্টা দেখা যায় মাঝে মধ্যে। কিন্তু যাকে সম্মান দেখানো হবে তারও একটা দায়িত্ব না থাকলে অসুবিধা হয়। অংক যেমন অংকই—কবিতা না, এও তেমনি।

তাই বড়বাবু ডিউটিকে 'গেট আউট' 'নিকালো' কিংবা তোর বাপের শ্রাদ্ধ করতে এসেছিস' ইত্যাদি কিছু না বলে শুধু বলল—এরপরে যখন ডিউটি করবে দাড়ি কামানো দেখি যেন।

ডিউটি কানাই ভুঁইয়া অজান্তে নিজের গালে একবার হাত ঘষে নিয়ে ভাবে, ধরা পড়ে গেল। মাকুন্দ লোকদের 'পুলিশে ঢোকা উচিত'।

—বুঝেছ?

—আজ্ঞে হাঁ স্যার।

—যাও, দারোগাপ্রসাদকে ডেকে দাও।

আর একখানা কড়া স্যালুট দিয়ে কানাই বার হয়ে যায়। বড়বাবু ভাবে, আগের দিনের ও সি হলে মুখখিস্তি তো করতই। ডিফল্ট করে, শাস্তির ব্যবস্থা করত। এখনো কিছু লোককে মনের সুখেগালাগাল দেওয়া যায়।

থানা ! তারা থানা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। থানা তাদের ধ্যান-জ্ঞান। তাদের দেশে অবসর গ্রহণের পর বার্ধক্যের বারাণসী তৈরীতে সাহায্য করে। তাই যৌবনের এই লীলাভূমি থেকে বদলী হয়ে যাবার ভয়ে তারা সব সময় কম্পমান। যতখুশী গালাগাল দাও তাদের।

দারোগাপ্রসাদ এসে দাঁড়ায়।

ও.সি. জিজ্ঞাসা করে—কী হয়েছে রে ?

—কুছ্ নেহি।

—আমি তোর কথা জিজ্ঞাসা করছি না। সবাই কেমন যেন চুপচাপ।

—হাঁ হাঁ সাব্। বুঝেছি ! ভবেশবাবু সাসপেণ্ড হইয়ে গেছেন।

—কোন্ ভবেশবাবু ?

—ভবেশ গুপ্ত সাব। এই থানায় পোস্টিং। ডিস্ট্রিক্ট অফিসে পি. বি. এক্স-এ কাজ করেন। ডিপুটিশানে আছেন স্যার। আমাদের ব্যারাকেই ওর সীট। বাড়ি থেকে ডিউটি করে।

—কি করেছিল ভবেশ ?

—আমি ডিউটি অফিসারকে ডাকিয়ে দিচ্ছি। তিনি সব জানেন।

—ডেকে দে।

ডিউটি অফিসার ইন্দ্রপাল এলে তাকে বসতে বলে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করে, ভবেশের কি হয়েছিল পাল ?

—আর বলবেন না স্যার। ওটা একটা হাঁদারাম। ই. বির ডি. সি. সাহেবের ওয়াইফ এখন দিল্লীতে আছেন।

—হতে পারে। দিল্লীতে শুনেছি ডি. সি.র শ্বশুরমশায় ব্যবসা করেন।

—হ্যাঁ। সেখানে থেকে ভদ্রমহিলা ডি. সি. সাহেবকে পি. বি. এক্স-এর থ্রুতে ট্রাংক কল করেন কাল রাত দশটার পরে। ভবেশের তখন ডিউটি ছিল।

—তারপর ?

—একথা সেকথার পর দুজনার মধ্যে রসের কথা আরম্ভ হয়েছিল।

বয়স তো বেশী নয় স্যার—ছেলেমানুষ। ডি সি. সাহেব একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তা তিনি করতে পারেন। শত হলেও পরস্ত্রী তো নয়। আর পরকীয়াও কি দোষের?

জ্ঞানের কথা ছাড়ো। কী রসের কথা হয়েছিল তাই বলো।

—ভবেশ কি কখনো বলে? অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি আমরা সবাই মিলে। তবু বলতে রাজী হলো না। শুধু বলল, সাংঘাতিক সব রসের কথা। ভীষণ সাংঘাতিক নাকি।

—যাকগে। তারপর কি হলো?

—ডি সি-র স্ত্রী বললেন, তুমি এসব বলছ, আমি কিন্তু পি বি এক্স্-এর থ্রুতে কথা বলছি। ভুলে গেলে নাকি? ডি সি বলেছিলেন, তাতে কি হলো? ওঁর স্ত্রী বললেন—কেউ ট্যাপ করে শুনতেও তো পারে। ডি. সি বললেন হুঃ আমাদের পুলিশ খুব ফেইথফুল। এ কি দিল্লী ভেবেছ নাকি? তারপরই তিনি এমনিতেই বললেন—"কি হে, তোমরা কেউ আড়ি পেতে শুনছ নাকি?" আর ভবেশটা একটা ঢ্যাড়শ। সে অমনি বলে ওঠে—না স্যার!

ও সি প্রথমে চমকে ওঠে। তারপরই হো হো করে হাসতে শুরু করে। খানিকটা হেসে নিয়ে একটু থেমে বলে—সত্যি?

তবে আর বলছি কি স্যার। ভবেশকে রাতেই উঠিয়ে দেওয়া হয়। আজ সাস্‌পেনশান্ অর্ডার বার হবে।

—আমার থানার সিপাই অথচ আমি জানলাম না?

—বড়সাহেব আপনাকে ফোনে জানান নি?

—না।

আপনি নাইট রাউণ্ডে ছিলেন বলে বোধহয় জানাতে পারেন নি।

ও সি. সন্তুষ্ট হয় না। সে বলে—হুঁ। অপরাধ কত মানুষ করে। যে ধরা পড়ে সবাই তার দিকে আঙুল তুলে দেখায়। যেন সে ছাড়া পৃথিবীর আর সবাই নিষ্পাপ। কদিন থেকে আমার দিন খারাপ যাচ্ছে। রাশিফল

বিশ্বাস কর পাল ?

—না স্যার। তবে কেউ যদি গোমেদ কিংবা প্রবাল ধারণ করতে বলে, আমি নিয়ে নেব।

—কেন ?

—দেখতে ভালো লাগে। স্ট্যাটাসের ব্যাপারও বটে।

—আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু চাপে পড়ে ওই ধরনের একটা কিছু ধারণ করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

—কিস্সু হবে না স্যার। যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে সেই ভাবেই চলতে হবে। আপনার ব্যাচের যশোদাবাবুকে দেখেন না ? গায়ে ফুঁ দিতে দিতে চলেছেন। অথচ একগাদা রিওয়ার্ড পেয়েছেন, গভর্নরের মেডেল পেয়েছেন। যাতে হাত দেন সেটাই সফল। ভাগ্য স্যার। আপনি একটু বেশী সিরিয়াস।

—ফাঁকিবাজ হতে বল নাকি ?

—তাই কখনো বলতে পারি ? কিন্তু যশোদাবাবু ফাঁকি না দিলেও, যতটা করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দেখান। আজকাল স্যার একটু "শো'-এর দরকার। এখন সেই যুগ পড়েছে।

—হুঁ। শোন পাল। বেশীদিন চোকোনি। এই মনোভাব ছেড়ে দাও। এভাবে চাকরী করা উচিত নয়। আমিও ধোয়া তুলসী পাতা নই। অনেক মিথ্যে কথা বলে অনেক কিছু এড়িয়ে যাই। একজন পুলিশ অফিসারের যতটুকু সাধ্য, আমাদের ওপরে অনেক সময় তার চেয়ে অনেক বেশী চাপ পড়ে। তবু যতটা সম্ভব করা উচিত। বিনিময়ে যখন মাইনে নিই।

ইন্দ্র পাল থতমত খেয়ে বলে—সে ঠিকই স্যার। আমরা কি করি না ?

—হয়তো কর। কিন্তু ওই ফাঁকি দেবার মনোবৃত্তিটা পুষে রাখা উচিত নয়। তোমার ওই 'শো'-এর কথা শুনে পান্না মিত্তিরের কথা মনে পড়ে।

ইন্দ্র পাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ও. সি-র মুখের দিকে চায়।

ও.সি. বলে—একবার ডিভিশান অফিসে সব ও.সি-দের ডেকে পাঠানো

হলো। কী একটা ফাংশান হবে, সেই ব্যাপারে। ডি. সি. এক একজনকে এক একটা কাজের ভার দিচ্ছেন। সবাই ঘাড় কাত করে রাজী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুটো কিংবা তিনটে দায়িত্ব দিতে গেলে সবাই মৃদু আপত্তি তুলে অস্বীকার করে যাচ্ছে। কিন্তু পান্না মিত্তিরকে ডি. সি. যত কাজের দায়িত্ব দিচ্ছেন, সে সবতাতেই রাজী হয়ে যাচ্ছে। শেষে দেখা গেল পান্না ছ'টা কাজের ভার পেয়েছে। ডি. সি. তখন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, —সবাই একটা বড়জোর দুটো ভার নিলেন, আপনি মশায় যা বলছি সবতাতেই রাজী হয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপার কি বলুন তো ? এত সব পারবেন তো ? পান্না মিত্তির চট্‌পট্ জবাব দেয়—কেউ কি পারে স্যার ? মানুষের পক্ষে এটা কি সম্ভব ? ডি. সি. আঁৎকে উঠে বলেন—সে কি ! আপনি একটু হলে আমাকে দেখছি ফাঁসিয়ে দিতেন। রাজী হলেন কেন তবে ? পান্না বিগলিত হাস হেসে বলে—আপনি স্যার আই পি. এস. অফিসার। কখনো আপত্তি জানাতে হয়? আমার ওপর আপনার ইম্‌প্রেসান খারাপ হয়ে যাবে না ? তাই সবতাতেই 'ওকে স্যার' 'ইয়েস স্যার' 'ভেরী ওয়েল স্যার' বলে যাচ্ছি। কাকে কতটা ভার দিতে হবে আপনি সব চেয়ে ভালো জানেন।

ইন্দ্র পাল হেঁকে উঠে বলে—ডি. সি কিছু বললেন না ?

—কী আর বলবেন ? মুখটা একটু লাল হলো। আসলে পান্না খুব একটা খারাপ অফিসার নয়। কথাবার্তা বেসামাল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তিনি সেটা জানতেন।

সেই সময় ফোন বেজে ওঠে। ইন্দ্র পাল চেয়ার ছেড়ে উঠতে চাইলে ও সি. কানে ফোন লাগিয়ে ইশারায় তাকে বসতে বলে।

ওদিক থেকে বড়সাহেব বলে—শুনেছেন তো কাণ্ডটা ?

—শুনলাম স্যার।

—কি হয়েছিল মশায় ?

—আপনি শোনেন নি ?

—ট্যাপ করেছিল শুনেছি।

—ঠিকই শুনেছেন।

—আরে মশাই সে আমিও জানি। ডি সি. ই বি. কিরকম শান্ত প্রকৃতির দেখেছেন তো ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তাঁর কথা শুনলে বিশ্বাস করতে পারতেন না। এত রেগে গিয়েছেন। পারলে ছিঁড়ে খান ওই সিপাইকে। তাই জিজ্ঞাসা করছি, কি কথা হচ্ছিল ফোনে ?

—ভবেশ কিছুতেই বলছে না। কাল রাত্রে সঙ্গে সঙ্গে যদি জানতে পারতাম, তাহলে ওর মুখ থেকে বার করতে পারতাম।

—আপনাকে ট্রাই করেছিলাম। আপনি রাউণ্ডে ছিলেন।

—গাড়িতে আমার ওয়ারলেশ সেট আছে। খবর দিলে আপনার বাড়িতে ফোন করতাম।

—তা ঠিক। অতটা খেয়াল হয় নি। যাহোক, হাবুর দলের খবর কি ?

—শুনেছি তারা বস্তিতে আসা-যাওয়া করছে।

—তুলে আনুন

—সহজে হবে না। বড় রকমের রেড দরকার। নেংড়া শেতল এখন ওদের মগজ। অপনি স্যার ডি সি কে বলে একটা জয়েণ্ট রেডের ব্যবস্থা করুন না।

—ধুৎ মশায়। ডি সি-কে বললেই শুনবেন নাকি ? সোমবার ক্রাইম কনফারেন্স আছে। সেদিন সি পি. যদি এ প্রসঙ্গে জানতে চান, তাহলে কি জবাব দেবেন ডি. সি. ?

ওসির খিস্তি করতে ইচ্ছে হয়। তবু চুপ করে থাকে। দেঁতো কাশীর দলের একজনকেও এখনো তোলা হলো না, অথচ হাবুর দলের ছেলে-গুলোকে তোলার জন্য এরা সবাই ব্যস্ত। আর এদের একবার তুললেই এরিয়ায় অশান্তি জেঁকে বসবে।

—কী মশায়। কথা বলছেন না কেন ?

—কনফারেন্সের আগে কতটা কি হয়, দেখে নিয়ে একটা জবাব ঠিক করব স্যার। ইতিমধ্যে আমি আপনাকে জয়েন্ট রেডের জন্যে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি।

—আরে, আপনি তো মশায় সাংঘাতিক লোক। সবতাতেই অত চিঠি-চাপাটি কেন?

—প্রমাণের জন্য। কী কী কাজ করতে চেয়েছি তার প্রমাণের দরকার। আজকাল মৌখিক সম্মতি দিয়ে প্রায় সবাই সব কিছু বেমালুম ভুলে যান। আপনিও তো ভুক্তভোগী। বিবিবাগানের সেই ফায়ারিং কেস্টা? কে ফায়ার ওপেনের অর্ডার দিলো প্রমাণই হলো না। ভাগ্যিস্ কেউ মরেনি। মরলে আর্মড পুলিশের সিপাহীর কি অবস্থা হতো?

—বুঝেছি।

ঝপ্ করে ফোন ছেড়ে দেয় বড়সাহেব।

ও সি, ফোন নামিয়ে ইন্দ্র পালের দিকে চেয়ে বলে—কি বুঝলে?

—আমি স্যার এক তরফা শুনছিলাম। তবু বুঝেছি মোটামুটি। তবে দাঁতো কাশী বা তার দলের কাউকে এ্যারেস্ট না করে এদের ধরা ভুল হবে। সিচুয়েশান খুব খারাপ হয়ে পড়বে।

ধাপার মাঠের বুক চিরে বাই-পাস্ তো কত আগেই হয়েছে। আরও কত নতুন নতুন রাস্তা তৈরীর উদ্যোগ চলেছে। কলকাতাকে ঘিরে যে একটা মোটামুটি সবুজ বেষ্টনী ছিল তা দ্রুত অবলুপ্ত হতে বসেছে ডো-ডো পাখীর মতো। তবু থামা যায় না। কলকাতার অবস্থা এখন সোনার তরীর মতো।

তবে এখনো মাঠপুকুরে আবর্জনার স্তূপ এসে পড়ে। আশপাশের কারখানায় এখনো চামড়া ট্যান্ করা হয়। ওদিকে শুয়োর আর গরুর জীবন-লীলা এখনো সাফ হচ্ছে কাছাকাছি দুইটি স্থানে। সুতরাং ধাপা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাতাসে আদি ও অকৃত্রিম গন্ধ এখনো ভেসে বেড়ায়। রাস্তায় চলার সময় সন্ধ্যা হলেই লক্ষ লক্ষ মশককুল প্রতিটি মানুষের মাথার

ওপর চক্রাকার ঘুরতে থাকে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। এদের মধ্যে পুরুষ মশার সংখ্যা কত থাকে জানা সম্ভব নয়। তবে স্ত্রী মশা যথেষ্টই থাকে। পুরুষ মশার মতো তারা যে নিরামিষাশী নয় সেটা মুহূর্তেই টের পাওয়া যায়। দিনের বেলা মাছির কুম্ভমেলা। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যুগে ধাপার মাঠে বসে কবিতা লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না সঠিক ভাবে।

তবু এখানে শাক সবজীর বাগান সবুজ সতেজ। বস্তির ঘরের ওপর লাউ-এর ডগা তুলে হৃষ্টপুষ্ট লাউ দুএক মাসের মধ্যেই ঘোমটার আড়ালে সুন্দরী বধূর মুখের মতো পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিতে শুরু করে। কুমড়োর ফুল ফোটে। প্রজাপতি ওড়ে। অন্য ফুলও ফোটে, মৌমাছি গুনগুন করে। আশেপাশের ক্ষেতে ফুলের চাষও কিছু হয়। এখানকার মৌলিক গন্ধকে ছাপিয়ে সেই সব সুবাসও মাঝে মাঝে নাকে এসে লাগে। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় নরক—সব হাত ধরাধরি করে রয়েছে। বহু দূরে মোটেই নয়।

তবু এখানে ন্যাটা ধাবর রক্তের মতো চাপ চাপ দারিদ্র্য থক্‌থক্‌ করছে প্রায় প্রতিটি ঘরেই। সিন্‌থেটিক প্যান্ট শার্টের দৌলতে বোঝা যায় না এখানকার তরুণেরা কতটা খিদে পেটের মধ্যে পুষে রেখে ঘুরে বেড়ায়। বোঝা যায় না উঠতি কিশোরীদের মুখের হাসি দেখেও। তারা জানেও না সুষম খাদ্য পেলে তারা শরীরে আর কতটা শক্তি পেত, তাদের ওষ্ঠ আরও কতটা রঙীন ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, বুক দুটো কতটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে পারত। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে প্রায় সবারই একমাত্র নেশা সিনেমা দেখা, যদি কালেভদ্রে কখনো পয়সা জোটে। অনেক বাস্তুতে টিভিও দেখা যায়। এদের নেই। তাই সিনেমাতে যেতে চায়। একমাত্র সিনেমায় তারা তাদের স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে দেখে কয়েক ঘণ্টার জন্য। হিমঘর ছেড়ে বার হয়ে আসার পরও কিছুক্ষণ একটা নায়ক নায়িকার ভাব মনের মধ্যে খেলা করে বেড়ায়। তারপর যত সময় পার হয়ে যায় সিনেমার সবচেয়ে সুন্দর গানের কলির সুর তুলতে শুরু

করে, তেমনি স্বপ্নের জগতও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। তারা আবার ফিরে আসে নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তব জগতে।

শিবুদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো না। মাঝে মধ্যে তারা দলবল নিয়ে অভিযানে বার হয় বটে, মোটা টাকাও পায় কিন্তু এসবের কোনো স্থিরতা নেই। দারিদ্র্য তাতে ঘোচে না। তবে সতীশ ড্রাইভারের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তাই "প্রিয়া" সিনেমা হল থেকে বের হয়ে সেদিন অপর্ণা বলে—একটা কিছু খেলে হতো।

হাবু চলে যাবার পর এই দুদিনে শিবুর পকেট খালি। সে বলে—চিনেবাদাম কিনব?

—ওমা, চিনেবাদাম খাব কেন? বরং চপ্ খেতে পারি। সেই সঙ্গে চা ভালো না?

শিবু আমতা আমতা করে বলে—হ্যাঁ, তা তো ভালোই।

—তবে চল, ওই যে ওটাতে।

শিবু নিজের সম্মান বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় বলে—অপর্ণা, আজ আমার একটু কাজ ছিল।

—এই সন্দেবেলায়।

—হ্যাঁ।

—কী কাজ? তোমরা তো খালি অকাজ কর। কী দরকার ওসব করার হাবুদা দেখলে না? কত ভালো ছিল মানুষটা। কীভাবে চলে গেল?

—অপর্ণা।

—না। কোনো কথা শুনতে চাই না। চল ওই রেস্টুরেণ্টে। ওই যে দেখছি ছোট ছোট খুপ্রি রয়েছে পর্দা ফেলা। তোমাকে যেতে হবে।

শিবু অবাক হয়ে ভাবে মাত্র দুদিনের প্রকৃত ঘনিষ্ঠতায় অপর্ণা তাকে নির্দেশ দিতে শুরু করেছে। তার ওপর অপর্ণার যেন পুরো অধিকার। ভাবতে খুব ভালোই লাগছে। কিন্তু—

শেষে বলেই ফেলে শিবু—অপর্ণা আজ টিকিট কাটার পরে আমার

আর পয়সা নেই।

খিলখিল করে হেসে ওঠে অপর্ণা--এই জন্যেই এত কাজ পড়েছে ? তাই বল। আমি কি তোমাকে খাওয়াতে বলেছিলাম ? তোমাদের খারাপ সময় যাচ্ছে আমি জানি। আজ আমি তোমাকে খাওয়াব।

—না না। তুমি খাওয়াবে কেন ? বরং আর একদিন—

—চল বলছি। কথা না শুনলে আড়ি করে দেবো।

—আড়ি ?

—হ্যাঁ। সত্যি ! জন্মের মতো আড়ি করে দেবো। আর ফিরে আসব না।

—তবে চল।

ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটাতে বসে পর্দা ফেলে দেয়। বয় এসে অর্ডার নিয়ে যায়। শিবুর দিকে চেয়ে অপর্ণা মৃদু হাসতে থাকে। এখানে শিবু এত কাছে অথচ কোনো রকম অসভ্যতা করতে পারছে না ভেবে মজা লাগছে। শিবু ভাবে পৃথিবীতে সবার কাছে সে বেপরোয়া। অন্য মেয়ে দেখলেও বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করে না অথচ অপর্ণার সামনে এমন হয়ে যায় কেন ? অপর্ণা এমনিতে খুব লাজুক, কিন্তু নির্জনে শিবুকে যে কয়বার পেয়েছে অদ্ভূত রকমের সহজ হয়ে উঠেছে। বরং শিবুই একটু কেমন হয়ে যায়। করালীর পিসির ঘরে অবশ্য শিবু হঠাৎ ভীষণ সাহসী হয়ে উঠেছিল। পিসি ভর করেছিল বোধহয়। নইলে ওভাবে অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরার কথা কল্পনা করা যায় ? সত্যি বলতে কি "ছাড়ো ছাড়ো" বলতে বলতেও অপর্ণা কেমন যেন তার গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ভাবতেও পারে না শিবু। হারুটা হতচ্ছাড়া।

অপর্ণা বলে—কি ভাবছ ?

—কই, কিছু না তো ?

—আমি জানি। পিসির ঘরে খুব আস্পর্ধা হয়েছিল তাই না ?

খপ্ করে অপর্ণার হাত চেপে ধরে শিবু বলে, না, অপর্ণা, মাইরি বলছি ইচ্ছে করে করিনি। হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল।

—স্বীকার করছ তাহলে, অন্যায় করেছ ?

—একশোবার। আমি কখনো অমন করেছি ? করতে দেখেছ ?

—আর কখনো করবে না তো ?

—এ্যাঁ।

—আর কখনো অমন অসভ্যতা করবে না তো ?

—না, মানে—

—কী।

—মানুষের কখন কি মতি হয়। হাবুকে দেখলে তো ? ক'দিন আগে দিব্যি চলাফেরা করছিল। হুট্ করে মুছে গেল। আমারও মনে হয়েছিল যদি আমিও অমন করে মুছে যাই। তুমি পিসির ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো এই বুঝি তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আর দেখা হবে না জীবনে। তাই—

অপর্ণার চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠলো। শিবু অবশ্য দেখতে পেল না। অপর্ণা জানে এদের এমন হয়। হাবুর আগেও হয়েছে। সবাই জানে। তাই সে চায় না শিবু অমন করুক। তবু শিবুর যা প্রভাব প্রতিপত্তি সাহসিকতা সবকিছুই তো এইজন্যেই। এসব ছাড়া শিবুর আর রইল কি ? ওর প্রতি আকর্ষণের অনেকটাই তাহলে চলে যাবে। একই বস্তিতে মানুষ হয়ে কবে শিবুকে সেইভাবে প্রথম দেখেছে মনে নেই। যখন দেখেছে এবং ভালো লেগেছে তখন শিবুর এখনকার পরিচয় সমেতই ভালো লেগেছে। শিবু যখন ছেঁড়া হাফ প্যান্ট পরে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যেত তখনকার কথাও অস্পষ্ট মনে পড়ে। খুব রোগা ঢ্যাঙা আর শ্যামলা অথচ চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা। হয়ত এভাবে বিচার করেনি। তবে দরিদ্র শিবুকে সাধারণ চোখেও তার খারাপ লাগেনি। তারপর একদিন চোখের দৃষ্টিতে রঙ লাগলো, আর সেই সঙ্গে নেশা। অথচ শিবুর চেয়ে হাবুর চেহারা ভালো। লোকে কত সুখ্যাতি করে। সে ফিটফাট থাকলে রীতিমত বড়লোক বলে মনে হয়। যদিও তার বোন শর্মিলা ময়লা ফ্রক

পরে এ-বাড়ি ওবাড়ি থেকে খুদ গম সংগ্রহ করে বেড়ায়। হাঁড়ি চড়ে না। হারু মদ খায়। তাতে অনেক পয়সা খরচ করে ফেলে। মদ যদি হারু না-ও খেতো, তবু তার দিকে নজর যেতো না অপর্ণার। শিবুর মধ্যে যে পুরুষালী বেপরোয়া ভাব আছে, হারুর মধ্যে সেটা নেই। হারু একেবারে সাদামাটা। ইচ্ছে করলে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়।

হঠাৎ অপর্ণা কথা বন্ধ করে চুপ হয়ে যেতে শিবুর অস্বস্তি হয়। সে ডাকে—অপর্ণা।

—উঁ।

—তুমি আড়ি করে দাও নি তো?

—না, আড়ি করব কেন?

—আমি অন্যায় করে ফেলেছিলাম কিনা।

—অন্যায় তো একটু করেছ। হারুদা দেখে ফেলল।

শিবু ফুঁসে উঠে বলে—ও শালাকে আমি হাপিস করে দেবো।

—সে আবার কি কথা?

—না। এমনি বলছি। কী আস্পর্ধা দেখলে? হাবুর পরে আমি হলাম ওদের লীডার। সেটা ভুলে গেল?

—তুমি লীডার?

—তাছাড়া কি? তুমি শেতলকে লীডার ভাব নাকি?

—আমি কিছু ভাবি না। তাই বলে তুমি লীডার হলে আমার আনন্দ হবে ভাবছ?

—হবে না?

—একটুও না।

—কিন্তু হাবুর পরে, আর কেউ নেই। আমাকে হতেই হবে। আমি এখনি লীডার।

বয় এসে দুটো প্লেটে দুটো করে চপ্ দিয়ে যায় গরম গরম। সুঘ্রাণ

বার হয়। শিবুর জিভে জল আসে।

অপর্ণা নিজের দুই হাতের আঙুল নিয়ে নিজেই খেলা করতে করতে একটা কিছু বলবে বলবে করে শেষে বলে—আজ বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি বলে বের হয়েছি। মায়ের খুব সন্দেহ। বলেছি সিনেমায় যাব। বেশীক্ষণ থাকা যাবে না। একটা কথা—

—কী কথা। বল অপর্ণা।

—তুমি সত্যি বলবে তো?

—হ্যাঁ। বলব। তোমাকে অন্তত—

—তুমি কি আমাকে চাও?

শিবু সামনের গরম চপ্-এর কথা বেমালুম ভুলে যায়। কোথায় সে বসে আছে, সেকথাও মনে থাকে না। সব কেমন হয়ে যায়। শেষে সংবিৎ ফিরে পেয়ে অপর্ণার হাতে হাত রেখে বলে—তুমি সত্যিই একথা জানতে চাইছ অপর্ণা? আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না। ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি প্রায় রোজই। অন্য কতসব মেয়ে আছে আমাদের ওখানে। তাদের কত মেরেছি ধরেছি জিভ ভেংচেছি। গালাগালি দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে কোনদিন "তুই" অবধি বলিনি। বলতে ইচ্ছে হতো না। মনে হতো তুমি খুব যত্নের। কথাও তোমার সঙ্গে বেশী বলিনি। দেখা হলে শুধু হাসতাম। তুমিও হাসতে। খুব মিষ্টি করে হাসতে।

অপর্ণা কেমন বিহ্বলভাবে বলে—জানি।

—আজ বুঝতে পারি, তখন থেকেই তোমাকে মনে মনে চাইতাম।

—আমিও তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি।

ঠারে ঠারে কত চোখ চাওয়া-চাওয়ি হয়েছে। কথাও হয়েছে। কিন্তু এভাবে স্পষ্ট করে অপর্ণা কখনো বলেনি। শিবুও অপর্ণাকে বলেনি অথচ ওরা জানত পরস্পরের মনের কথা।

শিবু আবেগে অপর্ণার গালদুটো দুহাতে চেপে ধরে ডাকে, অপর্ণা।

—উঁ।

—অর্পণা।

—খেয়ে নাও। দেরি হয়ে যাবে।

—কিন্তু।

—আর কিন্তু নয়। তুমি যদি এসব ছেড়ে একটা কিছু করতে কত ভালো হতো। এসবে আমি শান্তি পাই না।

—আমি ওদের ছাড়তে পারি না অপর্ণা। ওরা আমার ওপর নির্ভর করে। বিশ্বাসঘাতক হওয়া যায়?

—তবু চেষ্টা কর। আমার খুব ভয়। সবাই তোমাকে মান্য করে এতে যত আনন্দ তার চেয়ে বেশী ভয় তোমার জীবনের জন্যে। তুমি ছেড়ে দাও এসব। একবারে না পারো। আস্তে আস্তে।

—না অপর্ণা। তা ঠিক হয় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপর্ণা বলে—তাহলে আর হলো না।

—কি হলো না?

—যা বলেছিলাম, যা কল্পনা করেছিলাম।

—না অপর্ণা, এত তাড়াতাড়ি শেষ কথা বলো না। সময় দাও। আমাদের ভালো সময়ও তো আসতে পারে। এটা রাজনীতি।

—বোমাবাজী কি রাজনীতি?

—হ্যাঁ, তাই। এ থেকে সরে গেলেও আমি বাঁচতে পারব না। যারা আজ আমাকে লীডার বলছে, তারাই জন্মের মতো সরিয়ে দেবে। এ বড় বড় কঠিন ঠাঁই।

এবারে অপর্ণার ভয় হয়। কাছে গিয়ে না দেখলেও দূর থেকে হাবুর দেহটাকে দেখেছিল সে।

তবু সে বলে—তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমিও শিখছি। আমরা দুজন মিলে কিছু করতে পারব। বাবা তোমাদের ব্যাপারে কিছু না বললেও

বুঝতে পারি তোমাদের একেবারে দেখতে পারে না। মা-ও না। তাতে যায় আসে না। তুমি যদি ওদের কাছ থেকে চলে আসতে পার। আমি তোমার সঙ্গে সব জায়গায় যেতে রাজী। নইলে—

তার কথা শেষ না হতেই শিবু বলে—অপর্ণা এই মুহূর্তে কিছু বলা যায় না। তুমি কিংবা আমি কেউ-ই সিনেমার নায়ক-নায়িকা নই। হুট্ করে দু' জনাকে মিলিয়ে দিয়ে একটা কোকিল ডাকিয়ে গান গাইয়ে দিলেই মীমাংসা হয়ে যাবে না।

অপর্ণা মুখ ভার করে।

নেংড়া শেতল সন্ধ্যাবেলা ঘোষণা করল, আগামী কাল থানা ঘেরাও করা হবে। কেন? না, দেঁতো কাশী কিংবা তার সাকরেদদের কারও গায়ে এ পর্যন্ত পুলিশ হস্তস্পর্শ করে নি। অথচ রামশরণ এদিকে এসে ছুঁক্‌ছুঁক্ করছে রোজই। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নিউটনকে দেখে ফেলেছে একদিন। হারু একদিন সারা দিন হবিষ্যি করে অর্থাৎ কেনো না খেয়ে বিকেলের দিকে মাঞ্জা দিয়ে বার হচ্ছিল ঠিক তখন সামনে সাক্ষাৎ যমদূতের মতো রামশরণ। হারুকে দেখে সে বিগলিত হয়ে একটু হেঁ হেঁ করে হাসল। কিন্তু ওই হাসির বিগলিতার্থ শেতল ভালোই বোঝে। তাই আগেভাগে গিয়ে থানা ঘেরাও করতে হবে। তাহলে অন্তত এদের গায়ে খব তাড়াতাড়ি হাত পড়বে না। দুটো পিকেট বসেছে বস্তির দুই ধারে। তাছাড়া আল তাফের দোকানে মাঝে মধ্যে সাধারণ পোশাক পরা যারা এসে মিষ্টি হাসি হেসে চা খেয়ে যায়, তাদের দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না। দেখা যায় তাদের অনেকের সঙ্গে পিকেটের পুলিশের বন্ধুত্ব আছে। ওদের দেখলে বোঝা যায় দুবেলা বেশ ভালো ভাবে খেতে পায় ওরা। বস্তির লোকেদের মতো ওদের দেহে কিংবা পোশাকে বিশেষ কোনো অপূর্ণতা নেই। তাছাড়া সাধারণ পোশাক হলেও ওদের হাঁটার একটা তাল আছে, যেটা ওদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেংড়া হলেও শেতলের চোখ বড়

তীক্ষ্ণ। অন্যের যা নজর এড়িয়ে যায় তার চোখে ঠিক পড়ে। পুলিশ মিলিটারিরা দাদরা কিংবা কাহারবার তালে তালে চলে।

থানা ঘেরাও-এর ঘোষণা অল্প সময়ের মধ্যেই বস্তির প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেল। শিবুরা চমকে উঠলো। করালীর পিসির ঘরে তখন তাদের মিটিং চলছলি। হারুর বোন শর্মিলা এসে খবরটা দিয়েই চলে গেল। অপর্ণাও জানত শিবুরা ওই ঘরে রয়েছে তাতে তার গা ছম্ছম্ ভাবটা আর নেই। সে দেখল শর্মিলা ঘরে ঢুকে কিছু বলে আবার বের হয়ে গেল। তারপরই তার বাবা সতীশ ড্রাইভার বিতৃষ্ণায় মুখখানাকে কুঁচকে জানালো যে কাল দুপুরে থানা ঘেরাও করা হবে। নেংড়া শেতলের ফতোয়া। অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হবে।

ঘোত্না বলে উঠে—দারুণ প্ল্যান করেছে তো ?

শিবু কেন, কেউই অস্বীকার করতে পারে না কথাটা। নেংড়া শেতল বোমাবাজীকে রাজনীতির রূপ দিচ্ছে যা ওই শালার বীরেনবাবুও পারে নি। সে শুধু ধান্ধায় থাকে। এখন শিবুদের অতোটা পাত্তা না দিয়ে সে যেন একটু শেতলের দিকে বেশী ঝুঁকেছে। এক কথায় চন্দ্রমিস্ত্রির টালি এনে দিয়েছে। তা দিক। তবু শেতলের বুদ্ধির তারিফ না করে ওরা পারে না। এ লাইনে চিন্তা করার ক্ষমতাই ওদের নেই।

সুখেন বলে—বুদ্ধিটা বীরেনবাবু দেয় নি তো ?

তা হতে পারে। পারে বৈকি। কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। এ ধরনের প্ল্যান তার ব্রেন থেকে বার হবার সম্ভাবনা বেশী।

সেই সময় নিউটনের পিসি এসে আস্তে করে করালীর পিসির ঘরের দরজা ঠেলা দিয়ে একটু ফাঁক করে। দরজাটা খুলতে গেলেই ক্যাঁচ করে আওয়াজ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা তাদের আধখোলা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কে এলো। সে নিউটন, হারু, শিবু, সুখেন, মানিক সবাইকে এ ঘরে একে একে এসে ঢুকতে দেখেছে। প্রত্যেক বারই ক্যাঁচ করে শব্দ হয়েছে।

তারপরে এলো শার্মিলা। এবারে নিউটনের পিসি। সারাদিনে এই এক কাজ হয়েছে অপর্ণার।

ওদিকে নিউটনের পিসি দরজা ঠেলতে ভেতরেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

—নিউটন আছিস নাকি রে?

—আছি।

—তোর ওষুধ খাবার সময় হলো যে। এক কাজ হয়েছে। বার বার কাঁহাতক মনে করিয়ে দেবো?

চটে গিয়ে নিউটন বলে—যাও তো! খালি ওষুধ ওষুধ—

—হ্যাঁ, এমনিতে নতুন আঙুল গজিয়ে যাবে। টিকটিকির ল্যাজ কিনা।

ঘোতনা হেসে ওঠে।

তাতে নিউটন আরও চটে গিয়ে বলে—যাও তো এখন। যখন খাওয়ার খেয়ে নেব।

—হয়েছে যত জ্বালা।

নিউটন বলে—দাও। দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও।

পিসি ভেতরে ঢুকে নিউটনের হাতে ট্যাবলেট দিয়ে শিবুর দিকে তাকিয়ে বলে—একটা খবর ছিল রে শিবু।

শিবু বলে—থানাঘেরাও তো।

—সে তো আছেই। আমি বলছি অন্য কথা। শেতল একবার তোদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তোরা যাবি? না ওকে ডেকে আনব?

ওরাই যায়। এতদিন এই ঘৃণ্য খঞ্জ মানুষটির ঘরখানা বাইরে থেকে দেখেছে ওরা। আজ জীবনে প্রথম তার ঘরে ঢুকলো। এতদিন লোকটির সঙ্গে কথাও বলে নি। বোধহয় মা-বাবাই ও লোকটিকে এড়িয়ে চলতে শিক্ষাটা দিয়েছিল। কথনো তার সঙ্গে কথা বলে নি। চিরকাল দেখেছে নিজের মতো থাকে লোকটা। নিজের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। ঘরের সামনে খানিকটা জায়গা পড়ে রয়েছে। ইচ্ছে করলে নানান তরকারির চাষ করা যায়। কিন্তু জমিটুকুর ভাগ্যও তারই মতো অবহেলিত। সে

কিছু করে না। কোনো শ্রী নেই ঘরের বাইরে।

আজ প্রথম ঘরে ঢুকে দেখলো ভেতরের অবস্থাও বাইরের মতো শ্রীহীন। অবশ্য কার ঘরেই বা শ্রী রয়েছে। তবু প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিচ্ছন্নতার স্পর্শ অন্য ঘরে পাওয়া যায়। এ ঘরে সে সবের বালাই নেই।

—তোরা এসেছিস? বসে পড় যেখানে পারিস।

ওরা বসার পর শিবুই প্রথম প্রশ্ন করে—থানা ঘেরাও হবে শুনলাম কাল?

হ্যাঁ। ঠিক করে ফেললাম।

—বীরেনবাবু এসে বলে গেলেন?

—বীরেনবাবু! সে কি করে বলবে! সে আমাদের নাড়ির খবর রাখে নাকি? ওরা রাজনীতি করে অন্য কারণে। আমাদের সমস্যার কথা বুঝবে কেমন করে? তোদের একটা কথা বলে দিচ্ছি। বীরেনবাবুর মতো মানুষদের দিয়ে যতটুকু সুবিধা আদায় করার করে নিবি। কিন্তু কখনো বিশ্বাস করবি না ওদের। মরবি। নিজের স্বার্থের জন্যে ওরা তোদের ক্ষতি করে দিতে পারে। ওরা সব পারে।

ঘোত্‌না বলে—জ্ঞান তো অনেক দিলে বাবা। এখন বলে ফেল তো। থানা ঘেরাও করতে চাও কেন?

রাগেরপরিবর্তে শীতলের মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়। সে বলে—তোদের জন্যে।

—আমাদের জন্যে তার মানে?

—তোরা সবাই এখানে ফিরে এসেছিস, পুলিশ ভালোভাবে জানে। রামশরণ সবাইকে এক আধবার দেখেছে। আর ওই সাদা পোশাকের মানুষগুলোও তোদের চেনে।

—তাই নাকি?

—আমরা যদি দল বেঁধে ছেলেমেয়ে কাচ্চা-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে থানার সামনে গিয়ে বসে পড়ি, যদি বলি দেঁতো কাশীর গ্রেপ্তার চাই, তার দলের

সবার বিচার চাই তাহলে তোদের ওপর ওরা সহজে হাত দিতে পারবে না। কিছুদিন তোরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবি।

কথাটার সারবত্তা ওরা মনে মনে মানতে বাধ্য হয়।

তবু শিবু প্রশ্ন করে, সবাই যেতে রাজী হয়েছে ?

—আমি যখন বলেছি, যাবে। সে ভার আমার।

—আমরা ?

—তোদের যেতে মানা করছি।

—বাসায় থাকব ?

—পাগল। সকাল থেকেই তোরা এক এক করে চলে যাবি। ফিরে আসবি আমরা থানা থেকে ফেরার পর। যদি পুলিশ জানতে পারে শুধু কয়জন এখানে একলা আছিস বাকী প্রায় সবাই চলে গিয়েছে থানায়, তাহলে আর রক্ষা নেই। আমরা থানা ঘেরাও করতে চলেছি, দেখবি পুলিশ আগে থেকে জেনে যাবে।

—কি করে ?

—বলে দেবে কেউ।

—কে বলে দেবে ?

—বলে দেবার লোক, সব সময়েই এক আধজন থাকে রে।

মানিক ফস করে বলে বসে—তুমি যেমন ছিলে ?

—তা বলতে পারিস, তবে জেনে রাখিস, যদি এই বস্তির ক্ষতি করার সামান্য ইচ্ছে থাকত আমার তাহলে তোরা সব কটা অনেক আগে কেওড়াতলা চলে যেতিস্। আমাকে যে চোখেই দেখিস না কেন বস্তির কারও কোনো অনিষ্ট কখনো করিনি। পুলিশকে আলতু ফালতু দু'একটা খবর দিতাম। ভাব দেখতাম, আমি খোঁড়া মানুষ আমার পায়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটাও খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

—আর কে খবর দেবে তাহলে ?

—কে দেবে কিংবা দিতে পারে, আমি জানি। তবে তোদের বলব না।

তোরা উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেলবি। যে খবর দেয় তাকে যদি ঠিকমতো চিনে রাখা যায় তাহলে অনেক বেশী সুবিধা। তাকে বিভ্রান্ত করে পুলিশকে নাচানো যায়।

সেদিন আরও অনেক আলোচনার পর ওরা যখন করালীর পিসির ঘরে গিয়ে আবার ঢুকলো তখন শেতল সম্পূর্ণ ওদের মনোভাব একেবারে পাল্‌টে দিয়েছে।

ক্যাঁচ করে শব্দ হতে জানলার ফাঁক দিয়ে অপর্ণা দেখলো কতকগুলো অশরীরী ছায়া একে একে সেই ঘরে ঢুকছে করালীর পিসির সঙ্গে বৈঠকে বসতে। একটু পরে ঘরে ফস্‌ করে দেশলাই জ্বালাবার শব্দ হলো। সিগারেটের কড়া-মিঠে গন্ধ ভেসে এলো। এইবার বাবুদের দ্বিতীয় দফার মিটিং শুরু হবে। কতক্ষণ চলবে ভগবান জানেন। অপর্ণা আস্তে করে জানলা ভেজিয়ে দিয়ে পাশের তক্তাপোষের ওপর গা এলিয়ে দেয়। তার এলোচুল তক্তাপোষের নীচে মাটিতে গিয়ে স্পর্শ করে। কিছু ভালো লাগে না তার। সে জানে মা ওভাবে তাকে দেখলে ঝাঁঝিয়ে উঠবে। ওই চুল বেয়ে পেত্নী ওঠে নাকি। তবু সে পড়ে থাকে ওই ভাবে। শুধু তার বুক ওঠা নামা করে।

ওদিকে জুলেখা তার ছেঁড়া চটের পর্দার ওপর দিয়ে কার ছায়া যেন চলে যেতে দেখলে। দূরের রাস্তার লাইটপোস্টের একফালি আলো অনেক কৌশলে কীভাবে যেন তার পর্দার ওপর এসে পড়ার পথ খুঁজে পায় রোজই। তাতেই সে ছায়াটা চলে যেতে দেখলো এবং ছায়াটি স্ত্রী-লোকের। সে চট্‌ করে উঠে পর্দা সরিয়ে মুখখানা বার করে দেয়।

জালাল শেখ এখনো বাড়ি ফেরে নি। সবে রাত নটা। বেশীর ভাগ দিনই রাত সাড়ে দশটা বেজে যায়। জুলেখার কোল শূন্য। সময় কাটে না। মাঝে মাঝে জালাল শেখ তাই তা—বলে ক্ষেপায়। জুলেখার বুক দুরদুর করে ওঠে। ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাড়িতে কচি শিশুর কলরব না থাকলে আনন্দ কোথায়? জালালের ঘরে যদি এক আধটা

থাকত তাহলে কখনই নিত্য এত রাত করে ফিরতো না। তাই কোনো একদিন কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে মন যদি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে, তাহলে তা এর পর'লাক' বলতে কতটুকু সময় লাগবে ? বস্তিতে সাক্ষীর অভাব হয় না। অন্তত জালালের হবে না। তার কিছু পয়সা আছে। হাসি আর কান্নায় ভেতরের ব্যবধান এক অতি পাতলা পর্দা দিয়ে তৈরি। অতি তুচ্ছ কারণে সেটি ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

আজও জুলেখা পর্দার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল। সেই সময় স্ত্রীলোকটিকে চলে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে মুখ বাড়ায়। চেনা সবাই। দুদণ্ড কথা বলা যাবে। কিন্তু নারীমূর্তিটি ততক্ষণে কিছু দূরে শেতলের ঘরের সামনে গিয়ে থেমেছে। জুলেখা দেখে সে চন্দ্রমিস্ত্রির বউ। বুকের ভেতরটা তার কেঁপে ওঠে। চন্দনাদের ঘর বস্তির আর এক প্রান্তে। সাহস তো কম নয়। নিশ্চয় চন্দনা-বউএর মাথাটা খারাপ হয়েছে। জুলেখা ওদের উপাখ্যান সবই জানে। এখানে কারও ঘরের কথা কারও অজানা থাকে না। তাই ভাবে, এই বয়সে ? ছিঃ।

জুলেখা দাঁড়িয়ে দেখে একটু ইতস্তত করে এদিক ওদিক চেয়ে চন্দনা দরজায় আস্তে ঠেলা দেয়। দরজা খুলে যায়। চন্দনা-বউ শেতলের ঘরে ঢোকে। জুলেখার নাক মুখ কান গন্‌গনে আগুনের মতো গরম হয়ে ওঠে। সে সরে যায় ভেতরে॥

খুব ভোর হতে না হতেই সাজ সাজ রব। অনেকের উনোনে আঁচ দেওয়া হলো। অনেকে রাতেই রুটি তরকারি করে রেখেছে। বাচ্চাদের জন্য ফেন রেখে দিয়েছে কেউ কেউ। পান্তাভাত রেখেছে ঘোতনার মা। হারুদের বাড়িতে হলো খুদকুঁড়োর ভাত। শর্মিলা যোগাড় করে এনেছিল। ওদের বাড়িতে মাসে পনেরো দিন চাল বাড়ন্ত। দাদার চেহারা রাজপুত্তুরের মতো হলে কি হবে, ধেনোর ভক্ত। তারই প্রতিক্রিয়া সংসারে। সবাই ছেলেপুলেদের খাইয়ে নিজেরা খেয়ে নিয়ে সাড়ে নটার মধ্যে

প্রস্তুত হয়ে আলতাফের দোকানের সামনে জড়ো হতে লাগলো, ঠিক দশটা বেজে বারো মিনিটে ওদের মিছিলের যাত্রা শুরু হলো।

শিবুর বাবা জিজ্ঞাসা করে—অতদূর হাঁটতে পারবে তো শেতল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

সব চেয়ে সামনে ওয়্যারলেস ভ্যান। তার অফিসার বার্তা পাঠাচ্ছে—ড্যানিয়েল কিং রিপোর্ট, মাই সিগ্‌ন্যাল ওভার।

ওদিকে কণ্ট্রোল থেকে জবাব এলো—ড্যানিয়েল কিং, ও. কে ওভার।

—ড্যানিয়েল কিং, দ্যা প্রসেশান জাস্ট নাও স্টার্টেড, ওভার।

—কণ্ট্রোল টু ড্যানিয়েল কিং, রজার। ইউ উইল লীড দি প্রসেশান।

এর পরেই কণ্ট্রোল থেকে ড্যানিয়েল কিং নামক ওয়্যারলেস ভ্যানের কাছে জানতে চাওয়া হলো, মিছিলে কত লোক আছে।

ড্যানিয়েল কিং উত্তর জানায়—স্ট্রেন্‌থ্‌ উইল বি এ্যাবাউট ফাইভ হানড্রেড ইনক্লুডিং নাইনটি উইমেন এ্যাণ্ড টোয়েনটি চিলড্রেন।

কণ্ট্রোল জানতে চায়, প্রসেশান লীড করছে কে?

ড্যানিয়েল কিং বলে—নেংড়া শেতল।

—কে? পুরো নাম কি?

—জেনে বলছি। আমাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

অফিসার এস বি-র কারও দেখা পায় না। সাধারণ পোশাকে তারা কোথায় মিশে রয়েছে। থানার কেউ সাধারণত এইসব জাতীয় মিছিলে সঙ্গে সঙ্গে থাকে না। তাই মিছিলেরই একজনকে অফিসার শেতলের পুরো নাম জিজ্ঞাসা করে।

কথাটা শেতল শুনতে পেয়ে অফিসারকে বলে—নেংড়া শেতল বললে চেনা উচিত। তবে আসল নাম শীতলকুমার চৌধুরী।

ওদিকে থানার নিজের অফিস ঘরে বড়বাবু চোখ মুখ লাল করে বসে আছে। সামনে দাঁড়িয়ে সেকেণ্ড অফিসার বর্মন আর ডিউটি অফিসার ইন্দ্রপাল। তারাও গম্ভীর।

ডি. সি. নিজে বড়বাবুর ওপর একহাত নিয়েছে। নেবেই। ডি সি-র দোষ নেই। নেংড়া শেতল মিছিল নিয়ে এসে থানা ঘেরাও করবে এখবর ও. সি-র কাছ থেকে না জেনে খোদ কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে জানতে হলো? অর্থাৎ এস বি অনেক আগে থেকে জেনে কমিশনার সাহেবের গোচরে এনেছে। লজ্জার কথা।

ও সি. যদিও বুঝলেন, এস. বি একটু বিশ্বাসহীনতার কাজ করেছে। কারণ থানাও এস. বি একসঙ্গে সাধারণত সব খবর নেয়। একে অন্যের ওপর সব সময় নির্ভর করে। থানা যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে এস্ বি. ও ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু যা হবার হয়ে গিয়েছে। নিজের স্টাফের জন্যে ডি. সি.র লজ্জা।

ইন্দ্র পালের দিকে চেয়ে ও সি বলে—সেদিন তো বলেছিলে কাজের চেয়ে 'শো' দরকার। এখন 'শো' দেখাও।

পাল বলে—দোষ আমাদের নিশ্চয় আছে। তবে কাঁধের ওপর সব সময় এত চাপ যে এই সব কম্যুনিকেশান গ্যাপ হতে বাধ্য। যাদের হয় না তারা ভাগ্যবান।

ও সি ফুঁসে ওঠে—সেকথা বলে তো আর নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। বদ্‌নামও ঘুচবে না।

পাল বলে—তা ঘুচবে না। কড়া কথা শুনতে হবে। আরও মারাত্মক কিছু হলে শাস্তিও পেতে হবে। যে শাস্তি পাবে অন্যেরা তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইবে—যেন মস্তবড় গবেট।

—দ্যাখো পাল, ওসব ফালতু কথা বলে কোনো লাভ নেই।

বর্মন পালকে টিপে দেয় চুপ করে থাকার জন্য। কিন্তু পাল থামেনা। বলে —জানি স্যার। কিছু বলেই কিছু হবে না। এখন আমরা ভাগ্যচক্রে আটকা পড়েছি। পুরু টাকার পরিশ্রমের ফল, এই সব আপ্তবাক্য এখন নিস্ফলা হয়ে গিয়েছে।

—তুমি আগে থেকেই একটা অসন্তুষ্টির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করছ। কোনো

ডিসিপ্লিনড্ ফোর্সে এটা মারাত্মক অপরাধ, ভুলে যেও না। এটা ঠিক নয়। যেটুকু আছে তাই দিয়ে চেষ্টা করা যায়। ডি. সি. কি আমাদের অবস্থা বুঝছেন না ? বুঝেও উপায় নেই। তাঁরও ওপরওয়ালা আছেন। ভাবতো, নিজের এরিয়া সম্বন্ধে তিনি নিজে অজ্ঞ, অথচ কমিশনার সাহেব তাঁর এলাকা সম্বন্ধে বলছেন ? যাহোক তোমরা এখন নীচে গিয়ে শেতলের দলের জন্যে অপেক্ষা করো। লালবাজার থেকে ফোর্স এসে গিয়েছে। তাদের ফল্-ইন্ করাও। আমি গিয়ে পোস্টিং করে দেবো।

অফিসাররা ঘর থেকে বার হয়ে গেলে ও সি ভাবে, আজকাল অনেকের মধ্যে কেমন একটা হতাশা, একটা অসন্তুষ্টি দানা বাঁধছে। একটা কিছু কারণ অবশ্যই আছে। তবে সবচেয়ে বড় কারণ ফোর্সে নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা কমে গিয়েছে। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবার মধ্যে একটা গলে যাওয়া গলে যাওয়া ভাব। যেন একতাল কাদা—যা বানাবে তাই হবে। চোয়াল শক্ত করে মেশিনের মতো এগিয়ে যাওয়ার শক্তি কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ মানবিকতাকে বিসর্জন না দিয়েও সেইভাবে চলা সম্ভব। বরং তাতে মানবিকতা রক্ষিত হয়।

ও সি চেয়ার ছেড়ে উঠবো উঠবো করছে, সেই সময় দারোগাপ্রসাদ ছুটতে ছুটতে এসে বলে—হোজুর, ডি. সি সাব এগিয়ে গেছেন।

—সেকি !

ও. সি. তাড়াতাড়ি নীচে ছোটে। ডি. সি. যে আসবেন, একথা তাকে ফোনে কিংবা ওয়্যারে জানান নি। হয়ত সময় পাননি। সে নীচে গিয়ে ডি সি কে স্যালুট করে দাঁড়াল।

ডি. সি স্যালুট রিসিভ করে বলে—একটা হেভী ফ্লাইং স্কোয়াড এসে গিয়েছে দেখছি। এতে আপনার হয়ে যাবে ? নাকি আরও ফোর্স দরকার ?

—এই যথেষ্ট স্যার। এত দরকার ছিল না।

—কিন্তু এ. সি. আরও ফোর্স চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, শীতল নাকি ডেঞ্জারাস। সেদিন শীতলকে আমিও তো দেখলাম। আপনার কি মনে

হয়।

—এ সি শীতলকে অনেক আগে থেকে চেনেন। উনি যখন এই থানার সেকেণ্ড অফিসার তখন শীতলের যুগ চলছিল। তাই উনি ভালো বোঝেন। তবে আজ শীতল যে জন্যে আসছে, তাতে এত ফোর্সের দরকার ছিল না।

—দেখা যাক।

ইতিমধ্যে এ সি সাহেবের গাড়িও এসে গেল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ডি. সি কে স্যালুট দিয়ে বলে—মাত্র একটা হেভী এসেছে। আরও ফোর্স এলে ভালো হতো স্যার।

ডি সি বলে—আজ এ্যাসেম্বলি অভিযান আছে। তার ওপর প্রেসি-ডেণ্টের আসার ব্যাপারে এস বি অনেক লোক নিয়ে রেখেছে। বেশী লোক পাওয়া গেল না।

এ. সি চিন্তিত হয়ে বলে—শেতল মব ক্ষেপাতে ওস্তাদ। সে যদি ওদের ক্ষেপিযে তোলে তা হলে কী হবে বলা মুশকিল।

নতুন ডি সি বডবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু ভরসা পায় যেন।

বডবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে ডি সি কে বলে—আপনি কি ওপরে গিয়ে বসবেন স্যার? ওদের আসতে দেরি আছে।

—চলুন।

এ সি কে ডেকে ডি. সি বলে—ব্যানার্জি, আপনি নীচে যান বরং

বড সাহেব গম্ভীর হয়ে বলে—ঠিক আছে স্যার।

ও সি বলে—উনিও ওপরে যেতে পারেন স্যার। ওরা যখন আসবে আমি থাকব।

ও. সির চেয়ারে ডি সি এসে বসে। এ সি ও ও সি অন্য দুটি চেয়ারে বসে।

ডি সি বলে—ওরা যে আসবে, খবরটা আপনারা পেলেন না কেন?

—পেয়েছি স্যার। দেরিতে পেয়েছি। আজ সকালে পেলাম। এতদিন

শেতল দু-একটা খবর দিত। এখন নতুন সোর্স তৈরি করতে হবে। এক-জনকে পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। শুনলাম শেতল চায়ের দোকানে বসে প্রকাশ্যে আলোচনা করেছে আজকের মিছিল সম্বন্ধে। তখন থানায় কেউ ছিল না।

—এটা ঠিক নয়।

ও. সি মনে মনে রামশরণের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে শান্ত স্বরে বলে—হ্যাঁ, স্যার। আমাদের জানা উচিত ছিল।

ডি সি. এ ব্যাপারে আর কিছু না বললেও এ সি প্রসঙ্গটা টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চালানোর জন্য উস্‌খুস করে। কিন্তু ডি সি-র কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত চেপে যায়। ও সি ঠিক করে ফেলে রামশরণকে এবারে সরাতে হবে। আর একটি চালাক চতুর ছেলেকে বেছে নিতে হবে। রামশরণের ভুঁড়ি বড্ড বেশী বেড়ে যাচ্ছে। ও সি শুনেছে, আগেকার দিনে পুলিশের বহু লোকের চেহারাই রামশরণের মতো দেখতে হতো। সে-সব লাল-পাগড়ির যুগের কথা। সেই যুগ আর নেই—অস্তমিত। নানান্ দিক দিয়ে ইতিমধ্যে পালাবদলের পালা ঘটে গিয়েছে। শোনা যায় এককালে "দারোগা হও" বলে আশীর্বাদের প্রচলন ছিল অর্থাৎ দু-হাতে পয়সা লুটে লক্ষ্মীর বরপুত্র হও। এখন লক্ষ্মীদেবী অন্য সব সরকারী প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার নিয়েছেন বলে পুলিশের মধ্যে কানাঘুষা চলে। পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এমন কি "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও" নয়।

মিছিলের আওয়াজ কানে আসে। নারী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠস্বরের শ্লোগান ধ্বনি। ও সি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। চৌমাথায় চলে এসেছে ওরা। দু'চার মিনিটের মধ্যেই থানার সামনে এসে উপস্থিত হবে।

সারি সারি সিপাহী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। গ্যাস এবং রাইফেল-ধারীদের সবার পেছনে থানা বিল্ডিং-এর কাছে রাখা হয়। সামনে দাঁড়ায় শুধু লাঠিওয়ালা পুলিশ।

ও. সি. ফোর্সকে উদ্দেশ্য করে বলে—আপনারা আমার অর্ডার ছাড়া লাঠি চালাবেন না, এমনকি ওদের কারও গায়ে হাতও দেবেন না। ওরা আজেবাজে কথা বলে আপনাদের মেজাজ বিগড়ে দেবার চেষ্টা করলেও শান্তভাবে থাকবেন। প্ররোচিত হবেন না।

শ্লোগান শোনা যায় "দেঁতো কাশীর গ্রেপ্তার চাই", "পুলিশ জুলুম চলবে না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও. সি. দেখে শেতল সত্যিই সবার আগে আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। দেখলে বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে আসতে।

মিছিল এসে পুলিশ কর্ডনের সামনে থেমে যায়। শেতল সবাইকে থানার গেটের সামনে বসে পড়তে বলে। সবাই বসে পড়ে।

শেতল বলে—আমরা এসে গিয়েছি বড়বাবু।

ও. সি. হেসে বলে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—আমাদের দাবীর কথাও জানেন নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, শ্লোগান শুনলাম।

—এবারে আপনাদের অভিমতটা জানতে চাই।

—যাদের নিয়ে এসেছ, তাদের সামনে ভাষণ-টাষণ-দেবে না?

কোনো দরকার নেই। এদের অনেকে আমার চেয়েও বেশী জানে। হয়ত ভাষণ দিতে পারবে না। কিন্তু অনেক বেশী ভুক্তভোগী। নইলে এক ডাকে সবাই এভাবে আসে? আমাদের বস্তিতে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। কয়েকজন বুড়োবুড়ি, অন্ধ আর রুগী, খুব কম সাধারণ মানুষ আর বেড়াল কুকুর খুনী ঘোরাফেরা করছে সেখানে।

—তুমি একাই কথা বলবে নাকি।

—তার মানে।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। ওপরে অফিস ঘরে বসে আলোচনা করাই ভালো।

ভীড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ চন্দ্র মিস্ত্রীর বউ ছিটকে সামনে এসিয়ে এসে

বলে—না, না। অফিস ঘরে যাওয়া চলবে না। অন্য পা'টাও খোঁড়া করে দেবে। ওদের বিশ্বাস নেই।

সবাই চন্দনার কথার সারবত্তা বুঝে গুঞ্জন করে সায় দেয়।

ও. সি. বলে—আমি শেতলকে একা যেতে বলছি না। আর কেউ আসুন না ওর সঙ্গে।

—কে যাবে? কে যাবে?

শেতল আব্বাসকে নির্বাচন করে। ঝুট ঝামেলার মধ্যে আব্বাস না থাকলেও তার মাথা ঠাণ্ডা এবং যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে ওস্তাদ। বস্তির যত ঝগড়াঝাটির কাজী সে। অনেকে তাকে আবার সালিস-মিয়া বলেও ডাকে।

সেই সময় চন্দনা-বউ বলে ওঠে—আমি যাব সঙ্গে।

জুলেখা বিবি বোরখার আড়াল থেকে এত বড় জিভ বার করে ফেলে। আর তো কেউ জানে না, চন্দনার অভিসারের কথা। মাত্র একদিন দেখেছে বলে এখনো চেপেচুপে আছে। দুদিন দেখতে পেলেই পেট কাঁপতে শুরু করবে কাউকে বলতে না পারলে। সে ভাবে কত নির্লজ্জ হতে পারে একটা মেয়েমানুষ।

শেতল চন্দনার মনের ভাব বুঝতে পারে। সে ও. সি.কে বলে—এখানে দাঁড়িয়েও কথাবার্তা হতে পারত।

ও. সি. বলে—তা পারত, যদি ঘটনাটা শুধু আমার এলাকার হতো। ভুলে যেও না দেঁতো কাশী আমার এলাকার বাইরে থাকে। তার সম্বন্ধে কোনো কথা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

—ওপরে গেলে পার্থক্যটা কি হবে?

—ওপরে ডি. সি. আছেন।

—ডি. সি. সাহেব আছেন। ঠিক আছে চলুন। আব্বাস আয়।

চন্দনা এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথা থেকে চন্দ্র মিস্ত্রি এসে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দনার হাত ধরে টানতে থাকে।

সবাই এই দৃষ্টিকটু দৃশ্যটা দেখে। কেউ ভ্রূ কুঁচকোয়, কেউ হেসে ফেলে। শেতল বলে—শুধু আব্বাস গেলেই হবে। আমাদের কিছু হলে সবাই তো এখানেই আছেন। আমরা দয়া চাইতে আসিনি। দাবী আদায় করতে এসেছি।

চন্দনার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখের মধ্যে বিশ-বছর আগের রক্তো-চ্ছাস দেখা যায়। শীতল দেখে আকৃষ্ট হয়। কাল রাতের অন্ধকারে অল্প-ক্ষণের জন্য চন্দনা তার কোল বুক ভিজিয়ে দিলেও এভাবে দেখবার অবকাশ হয় নি।

ও. সি.র ঘরে ঢুকে ডি. সি.র সঙ্গে এ. সি.-কেও বসে থাকতে দেখে শেতল বলে ওঠে—মেজবাবুও আছেন দেখছি।

এ সি. গম্ভীর হয়ে বলে—এখানে মেজবাবু কেউ নেই।

—ও, ভুল হয়ে গিয়েছে। সেকেণ্ড অফিসার ছিলেন তো সেই সব দিনে। এখন বড় সাহেব হয়েছেন।

এ. সি.র মাথা রীতিমত গরম হয়ে ওঠে।

ডি. সি. শেতল ও আব্বাসকে বসতে বলে বলেন—বলুন, আপনাদের কী দাবী।

শেতল বলে—দেঁতো কাশী দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে ধরবেন না আপনারা?

শেতলের কথা বলার ধরনে বড় সাহেব আর বড়বাবু দুজনই অস্বস্তি অনুভব করে। তাদের ইচ্ছা, তারা নিজেরা যেভাবে তাদের ওপরের দের অফিসারদের সঙ্গে ব্যবহার করে সবাই সেইভাবে সম্মান রেখে কথা বলুক। অন্তত নেংড়া শেতলের বেলায় সেই রকম আশাই করেছিল। কারণ লোকটা পোড় খাওয়া। কিন্তু এ যে দেখছি যুদ্ধং দেহি ভাব।

ডি সি. শান্তস্বরে বলে—ধরার চেষ্টা হচ্ছে।

আব্বাস বলে—চেষ্টা হলে আমরা একথা বলতাম না। আমাদের সঙ্গে লোক দিলে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি ও কোথায় আছে।

ডি. সি. উষ্ণ না হয়েও একটু জোর দিয়ে বলে—সেটা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন না কেন ?

শেতল বলে—দেখুন স্যার, পুলিশকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। আপনাদের আশ্বাসে কারও আস্থা নেই। কাজ করে দেখিয়ে দিতে হবে।

এ সি রেগে বলে—শেতল, তুমি বড় বেশী কথা বলছ।

শেতল কঠিন স্বরে বলে— দেখুন মেজবাবু, আমি ডি. সি. সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বসেছি। আমি কথা বলছি বস্তির সবার তরফ থেকে যারা থানা ঘিরে বসে রয়েছে। আপনাদের একজনকেও তারা বাইরে যেতে দেবে না। কিংবা ভেতরে ঢুকতে দেবে না যতক্ষণ না আমি তাদের ছেড়ে দিতে বলছি।

এ সি একটু হেসে বলে—আমাদের ফোর্স দেখোনি ?

শেতল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। বলে—তাহলে আলোচনাটা হলো না ডি সি সাহেব। উনি গায়ের জোর দেখাচ্ছেন।

ডি সি বড় সাহেবের ওপর স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে বলে—আপনি বসুন। কথাবার্তা বলার জন্যই আপনাদের ওপরে ডাকা হয়েছে। গায়ের জোর দেখাবার ইচ্ছে থাকলে গেট অবধি আসতে দিতাম না। এ সি সাহেব যা বলছেন, সেটা কথার কথা।

শেতল বসে পড়ে বলে—কথার কথারও একটা সীমা আছে স্যার। উনি উঁচু পোস্টে উঠেছেন। কিন্তু ব্যবহার আগের মতোই রয়ে গিয়েছে। শুনি তো আপনাদের কাঁধে যত স্টার বাড়ে বুদ্ধিও তত বেড়ে যায়। তেমন দেখতে পাচ্ছি না।

এ. সি. শেতলের কথায় তাজ্জব বনে যায়। ভীষণ সেয়ানা। কখন গরম হতে হয় ভালোই জানে। রাজনীতি করলে অনেক ওপরে উঠতে পারত। বড়সাহেবের উপর একহাত নিল বটে।

ডি সি বলে—কাশীকে আমরা ধরব। কথা দিচ্ছি।

—আপনি নিজে মুখে যখন স্যার কথা দিচ্ছেন, তখন এর জন্যে আমরা

ঠিক এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব।

—তাহলে আমাদের আলোচনা মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যায়।

আব্বাস বলে—আলোচনা আগে শেষ হোক।

—আপনাদের আর কি কথা আছে।

আব্বাস বলে—ন্যাটা হাবু যে মরল, সেই দোষ কি আমাদের বস্তির ছেলেদের। তারা কি মারল হাবুকে?

—ডি সি. বলে—তা কেন হবে।

—আমাদের ছেলেরা খুনে অপরাধীর মতো লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়ি থাকতে পারছে না।

—আপনি কি বলতে চান, তারা কখনো কোনো অপরাধ করে নি।

শেতল বলে—আমরা হাবুর ঘটনা নিয়ে কথা বলছি। দেঁতোরা ঘুরে বেড়াবে আর আমাদের ছেলেদের কথকার কোন্ পুলিশ কেসের অজ্-হাতে তুলে নিয়ে আসবেন, এটা মানব না।

এবারে বডবাবু বলে—তোমাদের ছেলেরা সুবোধ বালক নয় শেতল। দেঁতোদের খবর আমার না জানলেও চলবে কিন্তু তোমাদের ছেলেরা আমার এলাকায় থাকে। তাদের নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা।

—সে তো জানা থাকবেই। নইলে আর বড়বাবু হয়েছেন কেন? পুলিশে আসল বাবু তো একজনই। আমাকে . কী জ্ঞান দেবেন।

—তোমাকে জ্ঞান দেবার আস্পর্ধা আমার নেই। তুমি ওদের হয়ে ওকালতি করছ, তাই বলছি। আমি সুবিধে মতো ওদের ধরব। দেঁতো কাশীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তবে ডি. সি. সাহেব যদি অর্ডার দেন, আর তোমাদের ছেলেরা যদি শান্তশিষ্ট থাকে তাহলে কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

শেতল আবার গরম হয়ে উঠতে গিয়েও ও. সি-র চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে যায়।

ডি. সি. ও সি র কথায় প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করলেও, পরে স্থির কণ্ঠে

বলে—তবে ওই কথাই রইল। কাশীকে আমরা ধরার চেষ্টা করছি। আপনাদের ছেলেরা আপাতত ছাড়া রইল।

ঠিক সেই সময়ে ঝড়ের মতো বীরেন বটব্যাল এসে ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে শেতলকে দেখতে পেয়ে বলে—আমাকে একবার জানালে না। এ সব কথাবার্তা কি তোমরা চালাতে পারবে এঁদের সঙ্গে ?

শেতল ঈষৎ হেসে বলে—কোন্ কথাবার্তা বীরেনবাবু ?

—তোমরা যেজন্য এসেছ।

—কী জন্যে এসেছি।

—কেন, শ্লোগান শুনলাম দেঁতো কাশীর গ্রেপ্তার চাও।

—আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে। এবারে আমরা ফিরে যাচ্ছি।

কথাটা বলেই সে আববাসের পিঠে হাত রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে ডি সি. কে বলে—চললাম স্যার।

ডি. সি বলে—ফিরে যাচ্ছেন তো।

—হ্যাঁ। তবে ওই যে বললাম, একসপ্তাহ সময়।

বীরেনবাবুর মুখখানা কালো হয়ে যায়। এমন অপদস্থ সে বহুদিন হয় নি। ঠিক আছে। এক মাঘে শীত যায় না। তেমন বুঝলে ওদের মধ্যেই ঝগড়া বাধিয়ে দিতে হবে। ঝগড়া বাঁধানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। তখন টের পাবে, এই বীরেন বটব্যালকে কাজে লাগে কিনা।

সবাই চলে গেলে ডি সি. বড়সাহেবকে প্রশ্ন করে—ফোর্স তো কোনো কাজেই লাগলো না মিঃ ব্যানার্জি।

—হ্যাঁ স্যার। তাই দেখছি। আপনি ছিলেন বলে বোধহয় সাহস পায় নি।

ও সি বুঝল ডি সি. ঘুরিয়ে বড় সাহেবকে বেশ ঠুকে দিলো। বড় সাহেবও ছুঁচো গেলার মতো গিলে ফেলল।

মিছিল নিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সারা বস্তি নেংড়া শেতলের জয়গানে

মুখরিত। আব্বাস সবাইকে ডেকে ডেকে শুনিয়েছে শেতল কীভাবে কথা বলেছে ডি সি. সাহেবর সঙ্গে। একেবারে সমানে সমানে। কী কী কথা হয়েছে সব মুখস্থ বলার মতো বলছে আলতাফের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। ছেলেবুড়ো সবাই শুনলেন। বুড়োরা বলল, ওসব এখনকার ছেলেছোকরারা শুনুক। শেতলকে আমরা আগে থেকেই চিনি।

চন্দ্র মিস্ত্রি কিন্তু ফেরার সময় গজ্‌গজ করতে করতে ফিরেছে। বাড়িতে এসে ঘুমোয় না তাই ঝগড়া বাধিয়ে বসে। শেষে ঝগড়া এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয় যে চন্দ্র মিস্ত্রির মতো আপাত-শান্ত মানুষও চন্দনা-বউএর দিকে ছুটে গিয়ে মারতে ওঠে! চন্দনা এতটা ভাবেনি। যাকে সে একবিন্দু ভালো না বেসে বরং ঘৃণাই করে এসেছে, তাকে এই এতটা অসভ্য বলে সে কল্পনা করেনি। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে মিস্ত্রির দিকে চায়। তার চোখের দৃষ্টির ধাক্কাতেই চন্দ্র মিস্ত্রির হাত বাধাপ্রাপ্ত হয়। চন্দনা তবু চেয়ে চেয়ে দেখে মানুষটাকে। এতটুকু উত্তাপ নেই লোকটার মনে—শরীরে। জন্মাতে হয় তাই জন্মেছে। বড় হয়ে বিয়ে করতে হয় তাই করেছে। আর কাজ না করলে উপোস থাকতে হয় তাই একটু কাজ করে। নইলে পৃথিবীর সঙ্গে তার আর কোনোও সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ ছিল, বিয়ের পর প্রথম প্রথম প্রতি রাতে উত্যক্ত করত। বোধহয় বন্ধুদের উস্‌কানিতে। কিন্তু তাতেও কেমন খেয়ালী ভাব। চন্দনার গা ঘিন ঘিন করত। এখনো করে। তবু সহ্য করতে হয়।

চন্দ্রমিস্ত্রির কপাল খারাপ তাই তার মতো শান্ত ব্যক্তির অশান্ত মূর্তি একজন দেখে ফেলল। চন্দ্রমিস্ত্রির হাত যে মুহূর্তে চন্দনার ওপর উঠেছে আর ঠিক সেই মুহূর্তে হারুর বোন শর্মিলা ওদের চৌকাঠের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে থতমত খেয়ে যায়। মিস্ত্রি হাত সরিয়ে নিয়ে ঘরের একপাশে চলে যায়। শর্মিলা একটু দাঁড়িয়ে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই চন্দনা ডাকে—দাঁড়া।

শর্মিলার বয়স চোদ্দ পনেরো। সুতরাং সংসার সম্বন্ধে তার জ্ঞান ষোল-

ছেড়ে আঠারো আনা। বয়স তার মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়নও বাড়-বাড়ন্ত। তবে দারিদ্র্যের শুষ্কতা রয়েছে। হাতে তার সব সময়ই একটা ব্যাগ কিংবা একটা কলাই করা বাটি থাকে। তার দাদা সমবয়সী অন্য সব ছেলের মতো নয়। প্রথমত চেহারা ভালো বলে সাজতে গুজতে একটু ভালবাসে। তাতে খরচা করে কিছু। তার ওপর আর এক নেশা—চুল্লু। শর্মিলা সেটা প্রথমে বুঝতো না—এখন বোঝে। তাই হাবুর দলে থেকে যেটুকু রুজি রোজগার করে তার দাদা সবটাই প্রায় খরচা করে বাড়ি ফেরে। শর্মিলা এখনো জানে না, না, দাদা তার পাকাবাড়ির মেয়ের সঙ্গে প্রেমও করে। জানলে রীতিমত অবাক হতো। সেই সঙ্গে গম খুদ ইত্যাদি যোগাড়ের ভিক্ষা বৃত্তিতে মনের যে সঙ্কোচহীনতার প্রয়োজন সেটুকু হারিয়ে ফেলত।

চন্দ্র মিস্ত্রি মাথা নীচু করে বার হয়ে যায়। ওর ঘরখানা একটু আলাদা বলে ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ বাইরের কেউ বড় একটা শুনতে পেত না। আজ শর্মিলা তাকে হাত তোলা অবস্থায় দেখে ফেলেছে। তার বউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছিল। যেন বাঘিনী। মিস্ত্রি মরমে মরে যায়। একটু পরেই তো রটে যাবে। এতদিন তার সম্বন্ধে সবার যে ধারণা ছিল সব পাল্‌টে যাবে। থানার সামনে আগে একবার সে ধৈর্য হারিয়ে বাড়াবাড় করে ফেলেছিল। তখন সবাই দেখেছে। এখন শর্মিলার মুখের কাহিনী শুনে তারা স্থির নিশ্চয় হবে চন্দর মিস্‌তিরি দেখতে ন্যাকা, আসলে শেয়ানা।

চন্দ্র চলে গেলে তার বউ শর্মিলাকে বলে—কি জন্য এসেছিস।

—মিস্ত্রিকাকা তোমাকে মেরেছে ?

—না। তুই কেন এসেছিস ? গম নিবি ?

—আমি দেখছি মিস্ত্রিকাকা তোমার দিকে তেড়ে এলো। তারপর আমাকে দেখে বোধ হয় থেমে গেল। অনেক মেরেছে ?

—কে তোকে বলল, আমাকে মেরেছে ?

—হাত তুলে তেড়ে এলো যে?

—তা আসুক। তুই মারতে দেখেছিস?

—না। কিন্তু তুমি কেমন করে যেন তাকিয়েছিলে। মিস্ত্রিকাকুও চোখ মুখ লাল করে কেমন করছিল।

—ঝগড়া হচ্ছিল, বুঝলি? ঝগড়া হচ্ছিল। তোর বাপ-মাতে হয় না।

—হবে না কেন? কিন্তু আমার বাবা পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়ে থাকে। সে তো তেড়ে যেতে পারে না।

—থাক্। কেন এসেছিস্ এখন বল।

শর্মিলা জের টেনে বলে—বাবার পক্ষাঘাত না হলে কি তোমাদের সবার কাছে কথায় কথায় আসতে হতো? দাদা তো দেখে না।

—সব বুঝেছি। এখন তাড়াতাড়ি কেন এসেছিস। গম নিবি?

—দিলে কেন নেব না! তবে আমি এই জন্যে এসেছি—

শর্মিলা তার বাঁ হাত ওপর দিকে তুলে দেখায়। বাহাতের নীচের ফ্রক লম্বালম্বি ভাবে অনেকখানি ফেঁসে গিয়েছে। বহুদিনের ফ্রক। দিনে রাতে এই একটাই পরে থাকে। তার বয়সী অনেক মেয়েই ফ্রক পরে। অনেকে আবার সালোয়ার কামিজ জুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় অধিকাংশেরই ওই একটাই। শর্মিলার অসুবিধা, ঠিক মতো খেতে না পেলেও, তার শরীর বোধহয় আবহাওয়া থেকে রসদ সংগ্রহ করে দিব্যি বেড়ে উঠছে। বন্যার ঢল নেমেছে যেন। পুরোনো ফ্রক আর ধরে রাখতে পারে না। আর একদিন এমন হয়েছিল। সেদিন দেখা যাচ্ছিল বুকের এক দিকটা। প্রাণগোবিন্দের দশ বছরের ফাজিল ছেলে বকু একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সেখানে খোঁচা দিয়ে হি হি করে হেসে উঠেছিল। শর্মিলা তাড়াতাড়ি বিবেকানন্দের মতো ভঙ্গী করে বুকের ওপর হাত রেখে সেদিনই এসে দাঁড়িয়ে ছিল চন্দনার চৌকাঠে। তখন সে নীচেও কিছু পরত না। চন্দনা কাকী সেদিন নীচে পরার জামা দিয়েছিল একটা। আজ তাই ফেঁসে গেলেও একেবারে সেদিনের মতো হয় নি।

চন্দনা বউ বলে—সেই ব্রেসিয়ার আজও পরে আছিস। খুলিস নি।

শর্মিলা ফিসফিস করে বলে – রাতে খুলে রাখি। কেচেও দি কোনো কোনো দিন। ভোরবেলা পরে ফেলি।

—তোর জামাটা একেবারে পচে গিয়েছে দেখছি। সেলাই করলেও থাকবে না।

—এখনকার মতো করে দাও।

—কি করে করব ? সুঁচ ঢোকাবো কোথায় ? সুতোই বা কিসের জোরে থাকবে ?

শর্মিলা ভেঙে পড়ে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে টপ্ টপ্ করে।

চন্দনা-বউ থ' হয়ে কিছুক্ষণ শর্মিলার দিকে চেয়ে বসে থাকে। সে একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে।

শেষে বলে—একটা কাজ করতে পারবি ?

—কি ?

—তোর দাদার সার্ট-প্যান্ট আছে ?

—সে তো সিনেমা দেখার জন্যে যোগাড় করেছে। হাত দিতে দেয় না। ওতে কি হবে ?

—নিয়ে আয় তো।

—আমার হাত ভেঙে দেবে। মেরে ফেলবে।

চন্দনা-কাকীর চোখ দুটো একটু আগে মিস্ত্রি-কাকুর সামনে যেমন দেখতে লাগছিল, তেমনি দেখতে লাগল।

—ইস্, খেতে দিতে পারবেনা পরতে দিতে পারবে না নিজের বোনকে, হাত ভেঙে দিলেই হলো ? আমাকে ডাকবি।

চন্দনার এই মনের জোর কোথায় ছিল এতদিন ? আজ যেন সে হঠাৎ রাজরাজেশ্বরী।

শর্মিলা বলে—কিন্তু ওই প্যাণ্ট আমি কি করব ?

—যা বলছি তাই কর। নইলে চলে যা এখান থেকে।

শর্মিলা আস্তে আস্তে উঠে চলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। চন্দনা ভাবে, বেচারা বোধহয় আর আসবে না। কিন্তু লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে? চন্দনা মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করে। সেই সময়ে শর্মিলা শার্ট আর প্যাণ্ট এনে চন্দনার সামনে ধপ করে ফেলে দিয়ে বলে—এই নাও।

প্যাণ্টটা হাতে নিয়ে চন্দনা দেখে পা দুটো সরু সরু। ভালোই হয়েছে। সে শর্মিলাকে দাঁড় করিয়ে মোটামুটি একটু মেপে নেয়। তারপর কাটা-কুটি না করেই প্যাণ্ট আর শার্টের কিছু কিছু জায়গায় সুতো দিয়ে সেলাই করতে থাকে।

শর্মিলা প্রশ্ন করে—কি করবে গো কাকী? ফ্রক হবে কি করে?

—ফ্রক হবে কেন? প্যাণ্ট শার্টই পরবি।

—যাঃ, প্যাণ্ট শার্ট আবার কেউ পরে নাকি। কী যে বল তুমি।

—কেন, দেখিস নি পরতে কোনো মেয়েকে?

—তা দেখেছি। তাই বলে আমি?

চন্দনা এবারে রেগে ওঠে—তুই মানুষ না?

—তাই বলে কি পুরুষ মানুষ?

—দ্যাখ শর্মিলা, বেশী কথা বলবি না। সব ফেলে দেবো। ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াগে যা।

শর্মিলা মুখ ফ্যাকাশে করে বসে থাকে।

সেলাই শেষ করে চন্দনা-বউ বলে—নে পরে ফেল্।

কাঁদতে কাঁদতে শর্মিলা প্যাণ্ট পরে। সুন্দর ফিট্‌ করে। সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চন্দনার দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, চন্দনা বুঝি বিদ্রূপ করছে। বিদ্রূপ দূরে থাক সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল চন্দনা শর্মিলার দিকে। বেশ দেখতো' লাগছে। সে মিষ্টি হেসে বলে—তোকে ভীষণ ভালো দেখতে লাগছে। এবারে এই শার্টটা পরে ফেলতো?

—অত বড় শার্ট।

—পর তো। ঠিক করে দিলাম একটু। বড় হলে আবার ঠিক করে দেবো।

খুব বেশী বড় হলো না। হারুর চেহারা এমন কিছু দশাসই নয়। আর শর্মিলাও গায়ে গতরে বেশ ভারী। তাই একটু সেলাই করাতেই ঠিক হয়ে গেল। বেশ ফিট্ করেছে শার্ট আর প্যাণ্ট।

—এবারে ওই কোণে গিয়ে তোর ফ্রক খুলে নতুন পোশাক পরে ফেল্। ফ্রকটা ধুয়ে শুকিয়ে কাল দিয়ে যাবি। দেখি যদি অন্য কাপড় লাগিয়ে কিছু করতে পারি।

—সত্যি সত্যিই, এটা পরে বের হতে হবে?

চন্দনা কোনো কথা না বলে গম্ভীর হয়ে থাকে।

ঘরে বড় আয়না থাকলে নিজেকে একবার দেখে নিত শর্মিলা। তবু নতুন পোশাক পরে নিয়ে বাইরে যেতে বাধো বাধো ঠেকে। সবাই দেখে হেসে লুটোপুটি খাবে হয়ত।

চন্দনা উৎসাহ দিয়ে বলে—কেউ খারাপ বলবে না তোকে। এখন বেশ লাগছে। একটা চক্কর দিয়ে এসে আমাকে বলে যা তো। আমি বসে থাকছি তোর জন্যে।

সবাই শর্মিলার নতুন সাজ দেখে প্রথমে হাসলেও পরে খুব প্রশংসা করে। তার সমবয়সী কয়েকজন তো বলেই ফেলল, তারাও তাদের ভাই-দাদা-দের প্যাণ্ট শার্ট নিয়ে নেবে। কত সুবিধা। দেখতে কী স্মার্ট কিন্তু কয়-জনের দাদার দু প্রস্থ পোশাক আছে?

শিবু ঘোত্নারা সারাদিন চরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বস্তির কাছে আসে। শর্মিলা তার নব-সাজে খুবই সহজভাবে চলাফেরা করতে করতে সেই সময় আলতাফের চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হারু দূর থেকে চোখ রগ্ড়ে দিয়ে বলে ওঠে—আরে, শর্মিলার মতো দেখতে কে রে?

মানিক বলে—শর্মিলাই তো। বাঃ বাঃ দারুণ!

ওরা কাছে আসতে শর্মিলা ওদের দেখতে পেয়ে দাঁত বার করে হাসে। হারু প্রথমে বুঝতে পারে নি। তারপর ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই ছুটে গিয়ে বোনের মাথার চুল চেপে ধরে ঝাঁকাতে থাকে। কত সাধের শার্ট প্যাণ্ট তার। আলপনাকে টোপ ফেলার জন্য তৈরি করেছিল। আর শর্মিলা কিনা—মেরেই ফেলবে ওকে।

শিবুরা সবাই মিলে হারুকে চেপে ধরে জোর করে ছাড়িয়ে দেয়।

হারু চেঁচিয়ে ওঠে—হারামজাদী, আমার প্যাণ্ট শার্ট পরেছিস তুই কার হুকুমে?

শর্মিলা আগে কখনো দাদার হাতের মার খায় নি। জীবনে এই প্রথম। তাও আবার রাস্তার ওপর সবার চোখের সামনে। তার বয়স তাকে জানিয়ে দিলো এটা চূড়ান্ত অপমান। সে কাঁদতে গিয়েও শক্ত হয়ে ওঠে। চন্দনা-কাকীর কথাগুলো মনে পড়ে যায়।

রুখে বলে—হুকুম আবার কার? আমার হুকুম। জামা কিনে দিস্? খেতে দিস্? কে তোর খাবার জোগাড় করে রাখে? দোরে দোরে ভিক্ষে করে কে তোর পেট ভরায় খবর রাখিস? তুই না জানলেও, যাকে জিজ্ঞাসা করবি সে-ই বলে দেবে। তুই জানবি কি করে? যারা মদ খায় তাদের নেশা কাটলে কি করে? স্বভাবটাই বেহুঁশ হয়ে যায়।

হারু কেমন বোকা বোকা হয়ে চেয়ে থাকে তার এতদিনের শান্তশিষ্ট বোনটার দিকে। এমনকি শিবুরাও শর্মিলাকে নতুন করে দেখছে যেন। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবও পালটে গিয়েছে। বয়সে ছোট্ট মানিকের চোখে রঙ ধরল। সে আকৃষ্ট হলো এই প্রথম। অথচ শর্মিলাকে নিত্য দুবেলা দেখছে সে। এখন পোশাক যেমন হিরোইন হাণ্টারওয়ালীর মতো, কথাবার্তাও তেমনি চাবুক। আর মায়ের দৌলতে ভাই-বোন দুজনার রঙই মাজা-ঘষা।

শিবু সবকিছু হাল্‌কা করে দিয়ে হেসে বলে—যা-ই বলিস হারু, শর্মিলাকে

দেখতে বেশ লাগছে। তুই ওটাই পরিস শর্মিলা। হারুকে কিছুতেই দিবি না। আমরা তোর দিকে আছি।

মানিকের শর্মিলার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগেছিল। তারপর শর্মিলা যখন বাঁকা চাহনি হানলো তার দিকে তখন তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়।

এরপর আলতাফের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে ওরা চায়ের গ্লাস নিয়ে বসে। একজন সাদা পোশাকের পুলিশ ঘুরঘুর করছিল আর তাদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। কিছু এসে যায় না। নেংড়া শেতল বাজী মাৎ করে ফিরে এসেছে এ খবর ওরা পেয়ে গিয়েছে বাড়ি ফিরতে ফিরতে। তবে পুলিশের এত কাছে বসে চা খেলে আমেজ থাকে না। মনে হয় গায়ের ওপর দিয়ে ছারপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুট করে কামড়ে দেবে কখন।

ওদের সবার মুখে আলতো হাসির ছোঁয়া। ব্যতিক্রম শুধু সুখেন। সে একটু অন্যমনস্ক, একটু গম্ভীর। কেউ অতটা খেয়াল করে না।

আজ মানিকের মতো বাচ্চা ছেলেও সুখেনকে আবার খোঁটা দিয়েছে। ওদের চেয়ে মানিক অন্তত তিনচার বছরের ছোট। বিশের কোঠাতেও পা দেয় নি। সে-ও শেষে দেঁতো কাশীকে লক্ষ্য করে বোমা না ফাটায়। রসিকতা করল। যদিও শিবু সঙ্গে সঙ্গে ধমকে দিয়েছে, ঘোতনা কিল মেরেছে ওর পিঠে, তবু ওদের মগজের মধ্যে চিন্তাটা আছে এবং থেকে যাবে। সুখেন মনে মনে ঠিক করে সে একা গিয়ে দেঁতোকে খতম করে দিয়ে আসবে। না পারলে নিজে মরবে। সে জানে দেঁতোকে সব সময় তার বডিগার্ড কভার করে। করুক। এ অপমান অসহ্য।

চা খেতে খেতে ওরা ঠিক করে শেতলকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আসা দরকার। অনেক করেছে। এমন আগে কেউ করে নি। এতদিন বোমা-বাজী চলত শুধু, এখন শেতল রাজনীতি এনে ফেলেছে। বীরেনবাবু পর্যন্ত হার মেনেছে।

ওরা চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে শেতলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঠেলা দিতেই হাট হয়ে খুলে যায় দরজা। তারা দেখে শেতল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর এপাশ ওপাশ করছে।

ঘোতনা জিজ্ঞাসা করে—কী হয়েছে শেতলদা ?

—কিছু না। তোরা এসেছিস ? বোস।

শিবু বলে—তুমি ব্যথায় অস্থির দেখছি।

—এমন হয়। নতুন কিছু না। অনেকটা পথ হেঁটেছি। তার উপর আজ অমাবস্যা। পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় চোট খাওয়া জায়গাগুলো টন্‌-টন্‌ করে। আমার অভ্যাস আছে। কতদিনের ব্যথা। তোরা বোস। দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

হারু বলে—তোমার এত যন্ত্রণা হয় ? তোমার চোখে জল দেখছি।

—দূর বোকা। জল কোথায়। ভুল দেখছিস। তোদের মতো ছেলেরা ভূত দেখে।

হারু বলে—জল না তো কি, তেল ?

শেতল কিছু বলে না। যন্ত্রণা বেশী। তাই বালিশের নীচ থেকে একটা টাকা বার করে নিউটনের হাতে দিয়ে বলে—আলতাফের কাছ থেকে এ্যাস্‌প্রো নিয়ে আয় তো। দুটো খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

নিউটন চলে গেলে শেতল সবার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—আসলে এই যন্ত্রণাটা কুকুর পোষার মতো। বুঝলি ? বেশ সময় কেটে যায়। ওষুধ খাই না। তোরা না এলে আজও খেতাম না। ব্যথা ছাড়া আমার সঙ্গী-সাথী কেউ নেই যে।

ওরা হাঁ করে চেয়ে থাকে।

শেতল বলে—সুখেনের কি হয়েছে রে ?

সবাই সুখেনের দিকে চায়। সুখেন তাড়াতাড়ি বলে—কই কিছু না তো ?

—হয়েছে। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না।

শিবুরা সবাই মানিকের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকায়।
মানিক বলে—ও কিছু না শেতলদা। আমি একটু ক্ষেপিয়েছিলাম।
—খুব খারাপ। তোরা যে পথে নেমেছিস, সে পথে ক্ষেপানো মারাত্মক অপরাধ। এতে অনেক কিছু ঘটে যায়।
সেই সময় একটা হর্নের শব্দ শোনা যায়। সামনের রাস্তায় হর্ন বাজাচ্ছে কোনো প্রাইভেট কার। বোধহয় পুলিশের কোনো বড়কর্তা এসেছে। শিবুরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।
শেতল হাত তুলে বলে—চুপচাপ বসে থাক। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।
সেই সময় নিউটন হাতে এ্যাসপ্রো নিয়ে ঢোকে। তাকে প্রশ্ন করায় সে বলে—আমি কিছু দেখিনি। একজনের সঙ্গে গল্প করছিলাম, তাই একটু দেরি হলো।
ঘোতনা জিজ্ঞাসা করে—কার সঙ্গে?
নিউটন ঘোতনার দিকে চোখ টিপে বলে—সতীশ ড্রাইভার আছে না? তার মেয়ের সঙ্গে।
শিবু লাফিয়ে ওঠে—তার মানে? সতীশ ড্রাইভারের মেয়ে তো অপর্ণা।
—হ্যাঁ হ্যাঁ, অপর্ণা। নাম ভুলে গিয়েছিলাম।
শিবু সোজা বসে বলে—ইয়ার্কি হচ্ছে? নাম ভুলে গিয়েছিস? কী গপ্পো হচ্ছিল?
—এই যেমন, আমরা সারাদিন কি করলাম। খাওয়া-দাওয়া জুটলো কিনা। কটা পেটো থ্রো করলাম—
—চুপ কর শালা।
শেতল শিবুর উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণ বুঝতে পারে না। তাই বলে—তা বেশ করেছিস। দে, এ্যাস্‌প্রো দে। অপর্ণা আজ মিছিলের সামিল হয় নি। ওর মা গিয়েছিল। ও যায় নি। যাওয়া উচিত ছিল।
শিবু চুপ করে যায়।
সেই সময় শর্মিলা দাদার প্যান্ট শার্ট পরে বীরেন বটব্যালকে সঙ্গে নিয়ে

শেতল চৌধুরীর ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে যায়। মানিক অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। দারুণ দেখাচ্ছে তো শর্মিলাকে।

শিবুরা সবাই তাড়াতাড়ি উঠে বীরেনবাবুকে জায়গা করে দেয় বসবার। ওদের দেখে বীরেনবাবু একটু হকচকিয়ে যায়। নেংড়া শেতল এর মধ্যেই ওদের যেন হাত করে ফেলেছে। ফেলুক।

বীরেনবাবু বলে—শীতলবাবু অসুস্থ নাকি?

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই শেতল অনেকের কাছে শীতলবাবু হয়ে উঠেছে। 'তুমি থেকে আপনি'তে।

শেতল উত্তরে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। পায়ে একটু যন্ত্রণা। ও কিছু নয়।

—সেরে যাবে। এরা দেখছি সবাই আছে। ভালো হলো। আমি বলছিলাম কি, থানায় আমাকে কথা বলতে দিলে কী ক্ষতি হতো?

—আপনি যখন গিয়ে পৌঁছোলেন, তখন সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে।

—আমাকে কি একটা খবর দেওয়া যেত না?

—এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে আপনাকে নিয়ে টানাটানি করার কথা মাথায় আসে নি।

- এতবড় একটা প্রসেশান বার হলো। থানা ঘেরাও হলো। কাল কাগজে উঠবে নিশ্চয়। এটা ছোটখাটো ব্যাপার হলো?

—শুনুন বীরেনবাবু। আপনার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। আমার সময়ে আপনি ছিলেন না। তাই আপনার কথা মাথায় আসে নি।—শিবুরা ছিল?

—শিবুদের আমি বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই ফিরে এলো সবে। পুলিশের মতিগতির কথা বলা যায় না। ওপর থেকে কখন কি অর্ডার আসে ওরাও নাকি আগে থাকতে বুঝতে পারে না।

বীরেন বটব্যাল তিরস্কারের ভঙ্গীতে ওদের দিকে চাইল। ভাবখানা, নেংড়া শেতলকে পেয়ে যেন ভুলে আছো দেখছি। ফাঁদে পড়লে বুঝবে মজা!

খুব মোলায়েম ভাবে ওদের প্রশ্ন করে—তোরা কোথায় ছিলি রে ?

শিবু বলে—রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি।

—আমার বাড়িতে ওবেলা খাওয়া-দাওয়া করলেই পারতিস।

—আপনার ভাই তাড়িয়ে দিলে কি হতো ?

গম্ভীর হয়ে বীরেনবাবু বলে—ওকে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি। আর কখনো কিছু বলবে না তোদের।

শেতল চৌধুরী বলে—আবার যদি তেমন দুর্দিন আসে, আপনার ওখানে নিশ্চয়ই যাবে। আপনিই তো ওদের ভরসা।

বীরেন বটব্যাল ওঠার আগে বলে—সেই মিস্ত্রির টালি লাগানো হয়েছে ?

শেতল তাড়াতাড়ি বলে—হ্যাঁ। সুন্দর টালি। আপনি ছিলেন বলেই বেচারার ছাদ এত তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে গেল। নইলে টালির পয়সা জোটাতে কতদিন লাগত কে জানে।

বীরেনবাবু চলে গেলে, শেতল বলে—এদের কখনো চটাতে নেই। ভালো না করুক, যে কোনো মুহূর্তে খারাপ করে দিতে পারে নিজের স্বার্থে ঘা লাগলে। তাছাড়া এদের তোয়াজ করলে সময়ে অসময়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়। তোদের কপাল খারাপ, ভালো একজন লীডার তোদের নেই। থাকলে, দেঁতোর হিম্মত হতো না, তোদের ঘরে এসে হামলা করার। এই বীরেনবাবু নিজে গড়তে পারে না, সামনেও এগিয়ে আসতে পারে না। একটা কিছু ঘটে যাবার পরে ফল কুড়োতে আসে। আমি হলে এতদিনে ওকে চেঞ্জ করে দিতাম।

সুখেনের গাম্ভীর্য হঠাৎ চলে যায়। সে বলে ওঠে—চেঞ্জ করে দিতে ?

—আলবৎ।

—কি করে ?

—বীরেনেরও বাবা আছে দলে। আছে কি না ?

—তা আছে।

—তার কাছে গিয়ে সোজা বলতাম ওকে দিয়ে হবে না। অন্য ভালো লোক দিন। আসলে পার্টিতেও মুরুব্বি ধরা শুরু হয়েছে আজকাল। তাই বীরেনবাবুর মতো লোক লীডার হয়ে বসে আজকাল।

শিবু বলে—তুমি পারবে ওকে চেঞ্জ করতে?

—বলতে পারি না। আমাকে কেউ চেনে না। চিনলেও অল্প দু-একজন চেনে হয়তো। আমার বলায় কতটা কাজ হবে জানি না। তোরা চেষ্টা করে দেখ না। এখানকার ফ্যাক্টরীগুলোতে বীরেনবাবুর কেমন হাত আছে?

ঘোতনা বলে—একটা দুটোতে আছে। বাকীগুলোতে কিচ্ছু নেই।

—দেখেই বোঝা যায়। বীরেনবাবুর সঙ্গে যারা ইউনিয়ন করে তাদের মধ্যে কাকে তোদের মনে ধরে?

—মেজাম্মেল হককে। ওরা অনেক ভেবেচিন্তে নামটা বলে।

—ব্যাস্। ওই প্রস্তাব নিয়ে তোরা গিয়ে বলতে পারিস।

হারু বলে—বীরেনবাবু ফিউরিয়াস হয়ে উঠবে।

—বয়ে গেল। একটু রয়ে সয়ে তোরা সেই চেষ্টা করতে পারিস। তবে কর্পোরেশনের ভোটের পরে।

সেই সময়ে হঠাৎ আবার বস্বের নায়িকার প্রবেশ। অন্তত মানিকের সেই রকম মনে হলো। অল্প সময়ের মধ্যে সে তিন তিনবার চমকালো। এবারে শর্মিলা শুধু হাতে ঢুকলো না। একেবারে অন্নপূর্ণার রূপ। আলতাফের দোকানের কালি-পড়া সব চাইতে বড় কেটলী আর গোটা ছয়েক কাঁচের গ্লাস নিয়ে গ্লাসে গ্লাসে ঘর্ষণের মিষ্টি আওয়াজ তুলে ঢুকলো। এত আনন্দ ওরা বোধহয় জীবনে পায়নি। কত তেষ্টার নিবৃত্তি যে আচমকা অপ্রত্যাশিত এক কাপ চায়ে হয়, তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। হারু সুরের জগতে মূর্তিমান অসুরের মতো প্রশ্ন করে—পয়সা পেলি কোথায়—এঁ্যা!

নিউটন বলে—এ যে আলতাফ চাচার উনোন থেকে উঠিয়ে এনেছে

দেখছি।

ঘোতনার মুখেও হাসি ফোটে। সে বলে—পুলিশ, ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয় নি তো ? রাতের বেলা সব কটাকে উঠিয়ে নিয়ে হাজতে ভরবে।

শর্মিলা ফিক্ করে হেসে ফেলতেই মানিকও কেমন যেন বোকার মতো হেসে ফেলে।

হারু তবু ধমকায়—পয়সা কোথা পেলি বলবি না ?

শর্মিলা এবারে দাদার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—তোর জামা-প্যাণ্টের পকেট ছিল না সেকথা তুই ভালোই জানিস। এক টুকরো পোড়া সিগারেট ছিল। চিনেবাদামের খোসা ছিল। আর মেয়েদের চুলের বাহারী ক্লিপ্ পেলি কোথায় ? সেটাও ছিল।

—পাকা হয়েছিস খুব, তাই না ?

—অনেক ভাগ্য ভালো চা পেয়েছিস। খেয়ে নে।

মনিক বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। হারুদাটা বেশী বক্‌বক্ করে।

—তুই থাম্। ওকে খুব সাপোর্ট করছিস দেখছি। ব্যাপারখানা কি ?

মানিকের মুখ চুন হয়ে যায়।

শর্মিলা হাসে। শীতলও হেসে ওঠে। যন্ত্রণাটা ইতিমধ্যে মনে হয় কমতে শুরু করেছে এ্যাসপ্রো খেয়ে। সে বলে—ঠিক করে বল্তো সোজাসুজি, কি করে যোগাড় করলি চা ?

—বলতে মানা।

কী করে শর্মিলা বলবে যে পয়সাটা দিয়েছে চন্দনা-কাকী। বারবার নিষেধ করে দিয়েছে বলতে, মিস্ত্রিকাকুকে যে ভাবে তেড়ে উঠতে দেখেছে আজ, পয়সার কথা কানে গেলে কাকীকে সত্যিই পিটিয়ে দেবে।

নিউটন চোখ বুজে বলে—আত্মা যখন চা চা করছিল, ঠিক তখনি চাএসে হাজির।

হারু বোনের কথা একবিন্দু বিশ্বাস করে নি। তাই নিউটনের মন্তব্যে ক্ষেপে উঠে বলে—ওসব ভাবের কথা ছাড়। একটু আগে গিলে এলি

না ? এর মধ্যেই আত্মা চাঁ চাঁ করছিল ?

—তখন কি খাওয়া হয়েছে ! পুলিশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চা খাওয়া যায় ? এখন স্বাদ করে করে খেতে কত আরাম।

সুখেন চুপ করেই থাকে। বিশেষ কিছু বলে না। তবে চা খায়। খেতে ভালো লাগে। নিউটন মন্দ বলে নি। আত্মা চাইছিল। আত্মা সব কিছুই চায় আবার খাঁচা ছেড়ে কেটে পড়ে হাবুর মতো।

ভবেশ থানা ব্যারাকের মধ্যে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছিল। সে এখন সাস্‌পেন্‌ডেড হয়ে রয়েছে। কতদিন এভাবে চলবে কেউ জানে না। একবার সাস্‌পেন্ড হওয়ার ভয়ের কারণ সেটাই। ঠাকুরপুকুরে তার বাসা রয়েছে। সেখানে তার স্ত্রী আর বাচ্চা থাকে। ভবেশ সেখান থেকে ডিউটি করত। পি বি এক্স-এর কাজ সিফট্ অনুযায়ী ঘণ্টা মাপা। কোনো অসুবিধা হতো না। কত লোক আরও দূর থেকে এসে কত অন্য ধরনের ডিউটি করে পুলিশে। তবে তাদের ফ্যামিলির সঙ্গে থাকার অনুমতি রয়েছে। সেই হিসাবে বাড়ি ভাড়ার একটা অংশ পায়। ইংরাজ আমলে যে সব কড়াকড়ি ছিল তার অনেক কিছু শিথিল থেকে শিথিলতর হওয়ায় কলকাতার অনেক বাইরে থেকেও পুলিশ কর্মীদের কর্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে। ভবেশ একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছিল। সে ভেবেছিল যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই তার চলবে চিরকাল। পরিবারের সঙ্গে থাকার অনুমতি। চেয়ে নেয় নি আগে তাই সাস্‌পেন্ড হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে থানা ব্যারাকে থাকার আদেশ দেওয়া হলো। তবু বাঁচোয়া সাসপেনসান্ গার্ড অনেকদিন উঠে গিয়েছে—যেখানে শুধু সাময়িক বরখাস্ত সিপাহীরাই থাকত আর ঘন ঘন রোল কল নেওয়া হতো। এখন রোল কল এমনিতেই অনেকটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের মতো দাঁড়িয়েছে। তবে রাতে ব্যারাকে না থাকার যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। ভবেশের ক্ষেত্রে আরও বেশী ঝুঁকির। কারণ ঘটনাটা একজন ডি. সি-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

ফলে রাতের পর রাত বাড়ি থাকতে পারছে না সে। বাজার করে দিতে পারছে না ঠিকমত। কদিন আগে ছেলের অসুখ হলো, ডাক্তার ডাকতে পারে নি। পাড়ার লোকেরা তো দেখাশোনা করেছে। সে বাড়ি গেলে তার বউ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ভাবে এ আবার কি ধরনের চাকরী। ছেলের অসুখেও কিছু করা যায় না!

ভবেশ হাপুস নয়নে কাঁদে ব্যারাকে বসে, বলে আত্মহত্যা করবে সে। কারণ, বেশ কয়েক বছরের মধ্যে তার কেসের মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা নেই। ততদিন পুরো মাইনা পাবে না, বাড়ি যেতে হবে চোরের মতো। বউ এর সেই অদ্ভুত দৃষ্টি। নাঃ, সে আত্মহত্যা করবে।

সবাই নিজেদের সাধ্যমতো ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে ফল হয় না। কারণ এতে সত্যিই সান্ত্বনা দেবার মতো কিছু নেই। ঘোড়ায় কামড় দিলে মেঘ না ডাকলে নাকি ছাড়ে না। কবে মেঘ ডাকবে? এ ও তেমনি।

সুখরঞ্জন বলে—তুই বোকার মতো "না স্যার" বলেছিলি বটে। তবে ওপরওয়ালাকে তুষ্ট রেখে চাকরী করতে হলে বোকা সেজেই থাকতে হয়। তফাৎ হচ্ছে তুই বোকা না সেজে সত্যি সত্যি বোকা হয়েছিলি।

কানাই রেগে গিয়ে বলে—তোর কথার মানেটা কি দাঁড়ালো?

সুখরঞ্জন বলে—মানেটা হলো, ভবেশ খুব ভালো মানুষ তাই সত্যি কথা বলে বোকামী করেছে। তুই, আমি আমরা হলাম ধুরন্ধর। তাই জায়গা বুঝে বোকার অভিনয় করি।

দীপেন বলে—তুই পরিষ্কার বোঝাতে পারছিস না। কেমন যেন সব উল্টোপাল্টা—

—আরে বোঝাতে যদি পারতাম, তাহলে আই. পি. এস. হয়ে এসে তোদের ওপর ডাণ্ডা ঘোরাতাম। আমি বলছি, যদি নির্ঝঞ্ঝাট চাকরী করতে চাস্ তাহলে তোর ওপরের যে কোনো র‍্যাংকের অফিসারকে ভাবতে দিবি সে চালাক আর তুই একটা বোকা। অফিসার যদি ভেবে ফেলে

তুই তার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত, তাহলে তাকে সহজেই টুপি পরিয়ে দিতে পারবি। মনে রাখিস, পুলিশের বুদ্ধি মগজে থাকে না, র‍্যাংকে থাকে। তুই সিপাই, তার মানে ধরে নিতে হবে সব চাইতে হাঁদারাম।

কানাই চেঁচিয়ে বলে—ধরে নিলেই হলো ?

—না ধরিস তো মরগে যা—

—তুই ব্যাটা নিশ্চয় চোট্ পেয়েছিস।

—পেয়েছি মানে ? বলতে পারিস রোজ পাচ্ছি।

—তাহলে তুই-ও আসলে বোকা।

—আমারও তাই সন্দেহ। কিংবা মনে হয় অভিনয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। রাইফেলে বেশী তেল দিয়ে ট্রিগার টিপ্‌লে থট্ করে আওয়াজ হয়। গুলি বার হয় না। তাই ভালো করে ঘষতে হয়। পুল-থ্রু দিয়ে টেনে টেনে সাফ্ করতে হয় রাইফেলের নল।

সেই সময় হেডকন্‌স্টেবল দারোগাপ্রসাদ শুনিয়ে যায় আজ সবাইকে থানার চত্বরে ঠিক সাড়ে চারটের সময় ফুল ড্রেসে ফল-ইন্ হতে হবে। কমেমরেশান্ প্যারেডের জন্য ও. সি. সাহেব লোক বাছাই করবে। কাল পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে আসল বাছাই। এ সি, পি. টি. এস্. নিজে বাছাই করবে।

বিশ্বনাথের চাকরী বেশীদিন হয় নি। বলতে গেলে পি. টি. এস অর্থাৎ পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করেই থানায় এসেছে। বাড়ি ওর পুরুলিয়ায়। ওর কে একজন আত্মীয় বড় রাজনৈতিক নেতা। তাই সোজা থানায় আসা সম্ভব হয়েছে। সবাই ওকে আড়চোখে দেখে। ট্রেনিং থেকে সবাই সাধারণত আরমড্ পুলিশে যায়। সেখানে আট দশ বছর রগ্‌ড়ে তারপর থানা, ট্র্যাফিক, এস. বি-তে বদলি হয়। বিশ্বনাথ প্রথম চোটেই বুল্‌স্-আই।

সে এতক্ষণ এদের কথা চোখ বড় বড় করে শুনছিল। সব কিছু নতুন লাগে তার কাছে। খুব উৎসাহ। "কমেমরেশান্ প্যারেড" কথাটা শুনে

সে বলে ওঠে—সেটা কি প্যারেড ? নাম তো শুনিনি।

দীপেন ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—সব শুনবে ভাই। এখনো "দুধে দাঁত" পড়ে নি। আগে আক্কেল মাড়ি উঠুক, তবে তো ? এখন তো তুমি রংরুট।

বিশ্বনাথ একটু লজ্জা পেয়ে বলে—মাস্টার প্যারেডের মতো ?

কানাই বলে—আমাদের পুলিশে যারা ডিউটি করতে করতে মারা যায়, তাদের স্মরণ করে বছরে একদিন এই প্যারেড হয়। সারা ভারতেই হয়। গির্জায় প্রার্থনা হয়। আমি যখন হেয়ার স্ট্রীট থানায় ছিলাম তখন দেখেছি। তবে মন্দিরে কি মসজিদে প্রার্থনা হয় বলে শুনিনি। এসব হলো ইংরাজ আমলের ব্যাপার। এখনো টিকে আছে। চলে যাবে আস্তে আস্তে।

—কেন যাবে ? বিশ্বাস প্রশ্ন করে।

দীপেন বলে ওঠে—কানাই জ্ঞান দিস্ না। তুই আই. এ পাশ একথা কিছুতেই ভুলতে পারিস না। এ. এস আই-এর পরীক্ষাও তো দিলি না।

কানাই হেসে বিশ্বনাথকে বলে—সব আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আমাদের দেশের আবহাওয়া যেমন জলীয় মনটাও তাই। কিছুই ধরে রাখতে পারি না। গঙ্গায় বড় বড় জেটি ছিল, কোথায় চলে গেল। রাস্তায় জল দেওয়া হতো—এখন হয় না। দেখবি প্যারেডও এককালে উঠে যাবে। থাকবে শুধু অরাজকতা। ক্লাইভের আমলের মতো—একদিকে প্যারেড করা সৈন্য অন্যদিকে একগাদা গ্রামের মানুষ হাতে দা কুড়োল। তাই পলাশীতে পরাজয়।

সুখরঞ্জন বলে—বাপ্‌স্। খুব জ্ঞানের কথা ছাড়ছিস্ দেখছি। ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিস্ না। এসেছে টু-পাইস করতে, নিজের মতো চলতে দে। তবে আমি এই প্যারেড করব না। আবার সেই বুট বেল্ট পালিশ করা, জামা বানানো। ঝঞ্ঝাট। ওসব পোষাবে না।

সুখরঞ্জনের চেহারা খুব ভালো। কানাই হেসে বলে—তোকে দেখেই বাছাই করে নেবে। বরং আমার মতো শুঁট্‌কো চেহারা বেঁচে যাবে।

সুখরঞ্জন মুচকি হেসে বলে—দেখা যাক।

সেদিন থানা থেকে পাঁচজন কন্‌স্টেবল বাছাই করা হলো। কানাই বাদ গেল। সুখরঞ্জন, বিশ্বনাথ, আলম, বিন্দেশ্বর, দীপেন আর সুখদেওকে নেওয়া হলো। পরদিন পি টি. এস-এ ফাইনাল সিলেকশান্‌।

সেখানে সুখরঞ্জন সত্যিই বাদ গেল। বিশ্বনাথ অবাক হয়ে দেখলো, অমন সোজা চেহারার মানুষটা কেমন যেন এঁকেবেঁকে ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথার চুল বিশ্রী ভাবে বাইরে ক্যাপের ভেতর থেকে বার হয়ে এসেছে। ক্যাপটাও পরেছে ঠিক গাধার টুপির মতো। ট্রেনিং স্কুলের এ. সি. সাহেব ওকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে—ফল্‌-আউট্‌। আর সুখরঞ্জন মুখ কাঁচুমাচু করে, যেন কত অপরাধ করেছে সেই ভাবে বের হয়ে আসে। বিশ্বনাথ বুঝতে পারে, একেই বলে অভিনয়। বোকার অভিনয়।

সুখরঞ্জন ব্যারাকে ফিরে বলে—দেখনি তো?

দীপেন বলে—তোর মতো ক্যারিকেচার সবাই করতে পারে না ভাই। তুই দেশে যাত্রা করিস। 'রাম-রাবণ' পালায় রাবণ হোস্‌ আর 'সতীর আঁচল' পালায় আঁচল হোস্‌। তোর পক্ষে সব সম্ভব।

—তা যা বলেছিস। এবার শীতে "সুন্দরীর সিঁথি দিলো রাঙায়ে' পালায় নায়ক হয়ে সিঁথি রাঙাবো।

দীপেন বলে—সুন্দরী কে হবে রে?

—কলকাতা থেকেই ভাড়া করতে হবে।

—আমাকে একবার দেখাস ভাই নিয়ে যাবার আগে।

বিশ্বনাথ ওদের কথাবার্তা মনের আনন্দে উপভোগ করে। চাকরী ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য মুছে যায়। তবু সে মন্তব্য করে না কোনো। প্রথমত সে কিছুই জানে না কলকাতার থানার হাল চাল সম্বন্ধে। তার ওপর অন্য সবাই বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। কানাই ভুঁইয়া তার বাপের বয়সী।

সে শুনেছে কানাই-এর এক ছেলে সেন্ট জেভিয়ার্সে হায়ার সেকেণ্ডারী পড়ে। শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছে। গাঁয়ে থাকতে সেন্ট জেভিয়ার্সের নাম শুনেছে। সে তো স্বপ্নের রাজ্য। নিশ্চয় ভালো ছেলে। কানাইকে দেখে তার মনে সম্ভ্রম জাগে। তার বাবারও ইচ্ছা ছিল সে বড় হয়ে উঠুক। কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে তার বাবার হাঁটুতে পুলিশের গুলি লেগেছিল এককালে। সেই থেকে বাবা খোঁড়া। চাষাকে যেমন ভালো না বেসেও সম্মান দিয়ে বলা হয় চাষীভাই, তেমনি কানা খোঁড়া ইত্যাদিদের প্রতি মমতা না থাকলেও বলা হয় প্রতিবন্ধী। অনেকটা ভাতকে অন্ন বলার মতো। তাই বাবার অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়ল যে তাকে অবশেষে সে-ই পুলিশেই ঢুকতে হলো। তাদের গ্রামের সবাই প্রায় গরীব। তবু তার বাবার মামাতো ভাই বিষ্ণুকান্ত মাহাতো রাজনীতি করে ভালো নাম করেছে। যার জন্যে উচ্চতায় সামান্য খাটো হলেও সে পুলিশে ঢুকতে পেরেছে। তারপর যাতে বিশেষ কোনো কষ্ট না হয় সেজন্য ট্রেনিং শেষ হতেই থানায় পোস্টিং পেয়েছে। এখানে এসে সে প্রথম জানলো থানায় পোস্টিং-এর আসল অর্থ কি। তাই যাদের সঙ্গে সে টেট্রনিং-এ ছিল তাদের সবাই এখন তার শত্রু। কালেভদ্রে দেখা হলে বাঁকা কথা বলতে ছাড়ে না। যেন সে টাকার পাহাড় জমাচ্ছে।

সুখদেও একদিন তাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, কেমন হচ্ছে! শুনে তার বড্ড রাগ হয়েছিল। সুখদেও গোঁফের ফাঁকে হেসে বলেছিল—হোবে হোবে। তাড়াতাড়ি শিখে নে। আরে থানা এরিয়া তো বাগিচা হ্যায়। কুছ না কুছ মিলেগাই।

সুখরঞ্জন শুনে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—হ্যাঁরে বিশে, বাগানে এত ঘুরছিস, ফল কুড়িয়ে পাচ্ছিস না? সুখদেও-এর সঙ্গে একদিন ভীড়ে যা, দেখবি কীভাবে পাথর নিংড়ে রস বার করতে হয়। আগে নাকি পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট অন্য সব সরকারী ডিপার্টমেণ্টকে হারিয়ে পয়সা কামাই-এর ব্যাপারে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতো। আজকাল সেই রামও নেই অযোধ্যাও

নেই। আজকাল অন্য বহু ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড, ফোর্থ কত কি স্ট্যাণ্ড করছে। আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট "পি" ডিভিসানে পাশ করছে। তবে বদনামটা এখনো রয়ে গিয়েছে। থাকবেই তো। যেটুকু নিতে হয় পাঁচজনের সামনে নিতে হয় কিনা। প্রকাশ্য দিবালোকে রাহাজানির মতো।

বিশ্বনাথ রেগে গিয়ে বলে—আপনি নেন?

—আমি? আরে আমার কথা বাদ দে। আমি তো ব্যাচেলার। ত্রিভুবনে আমার কেউ নেই। কার জন্যে নেব?

—মা, বাবা?

—কেউ নেই, কেউ নেই।

—বিয়ে করেন নি?

—আরে না। আমার কথা ছেড়ে দে। যদি শরীরটাকে সুন্দর রাখতে চাস্, তাহলে সুখদেও-এর পথ নে। বাড়িতে জমি করতে পারবি, মন্দির বানাতে পারবি। সবাই খাতির করবে। তাই না রে সুখদেও?

—জরুর।

—আর তা যদি না পারিস কানাই ভুঁইয়ার অবস্থা হবে। দিন দিন আম্সি হতে হতে একদিন ভ্যানিস হয়ে যাবি।

—ওঁর ছেলেরা পড়াশোনায় খুব ভালো।

—হ্যাঁ, তা বটে। দুটোই ভালো।

—ভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে।

সুখরঞ্জন হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—এ যুগে জন্মে তুই কোথায় পড়ে আছিস রে? তুই প্রহ্লাদের অবতার নাকি। তুইও ভ্যানিশ হয়ে যাবি যে। থানায় এলি কেন? তোদের পুরুলিয়ার ছেলেরা জানতাম খুব প্র্যাকটিকাল। ডি. ডি-র কৃষ্ণরাম ভগত তোদের জেলার লোক। গিয়ে দেখে আয়গে যা। দরখাস্ত দিয়ে আর্মড্ পুলিশে চলে যাওয়া উচিত তোর। দাঁড়া কাল থেকে তোর ব্রেন ওয়াশ্ শুরু করতে হবে। নইলে

বাঁচতে পারবি না। জানিস, এটা গণতন্ত্রের দেশ? এদেশের অধিকাংশ মানুষ যা করে তুই-ও তাই করতে বাধ্য। করব না বললেই হলো? মামার বাড়ির আবদার?

বিশ্বনাথ সুখরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, সে সত্যি সত্যিই একথা বলছে না রসিকতা করছে।

সুখেন একা একা লাউ-এর ক্ষেতের মধ্যে বসে চারখানা পেটো বানিয়েছে। আগের পঁচিশ-ত্রিশটা এখনো স্টকে আছে। কিন্তু তাদের একটা যখন মোক্ষম সময়ে নেমকহারামি করল, তখন আর বিশ্বাস নেই। তাই ফ্রেশ মাল নিয়ে এসে করালী পিসির রান্নার জায়গায় মাথার ওপরে যে বাঁশের পাটাতন আছে, সেখানে একটা পুরোনো তেঁতুলের হাঁড়ির ভেতরে পৃথক ভাবে রেখে দিলো। সে জানে, পিসির ঘরে নতুন লোক আসার সম্ভাবনা নেই, করালী এই ঘরের ভাড়া টেনে যাচ্ছে। সে তারাতলা রোডের একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। পিসি যখন বেঁচে ছিল তখনো বড় একটা থাকত না। চুল্লুর নেশা রয়েছে তার। রাতে ফেরার অসুবিধা আছে। তবু ঘরখানা ছাড়তে চায় না। শত হলেও নিজস্ব আস্তানা তো। তার ওপর মাঝে মাঝে বিয়ে করার শখ হয়। রাস্তায় সুশ্রী মেয়ে দেখলে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। আর রাতে এসে গলায় চুল্লু ঢেলে সঙ্গীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে জীবনে আর কখনো নেশা করবে না। ঘরে একটা বউ এনে শান্তশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেবে। এটাই তার শেষ নেশার রাত। এমন ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। ঘর আর বাঁধা হয় না। তবু ঘরের ভাড়া টেনে যায়। নিজস্ব আস্তানা তো বটেই। তাছাড়াও এই ঘরখানা তার বাল্যের ক্রীড়াক্ষেত্র, যৌবনের রঙ্গভূমি না হোক, বার্ধক্যের আশ্রয় স্থল হতে পারে।

পিসি মরলে খবর পেয়ে করালী এসেছিল। হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল কিছুক্ষণ। তারপর তারাতলারই কয়েকটা ফ্যাক্টরীর সাত আটজনকে নিয়ে এসে মাল গিলিয়ে পিসির দেহটাকে খাটিয়ায় তুলে ভালোভাবে

বেঁধে উৎকট স্বরে 'বল হরি হরিবোল' বলতে বলতে ছুটলো নেশার ঝোঁকে। পিসির মাথাটা ওদের দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করতে লাগলো। মনে হলো বুঝি ধড় থেকে সেটি ছিটকে বেরিয়ে পাশের বেগুনের ক্ষেতের মধ্যে বলের মতো গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঢুকে পড়বে।

সতীশ ড্রাইভার করালীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শ্রাদ্ধ কোথায় করবে সে। উত্তরে বলেছিল, কালীঘাট। তা ভালো। কালীঘাটের মতো জায়গা আছে নাকি ভূ-ভারতে ? সাম্য মৈত্র স্বাধীনতার লীলাভূমি। মা' নিজে সদা-জাগ্রত সাক্ষী। অবোধ সন্তানরা যা করে হাসি মুখে মেনে নেন। তিনি তো জানেন এই বস্তু জগত মায়া-প্রপঞ্চ।

সুখেন পেটো রাখতে ঘরে ঢোকার সময় যথারীতি ক্যাঁচ করে শব্দ হয়েছিল পিসির দরজায়। শব্দটি কদিন থেকে অপর্ণার কাছে কালিনী নই কুল থেকে ভেসে আসা শ্যামের বাঁশীর মতো। সে অমনি ঘরের কোণ থেকে ছুটে গিয়ে জানলার আড়ালে দাঁড়ায়। অন্ধকার হলেও লোক চিনতে অসুবিধা হবে না। নিশ্চয় শিবু। আবার বোধহয় মিটিং বসাবে। ও একা যদি ঘর থেকে বের হয় অপর্ণা ছাড়বে না কিছুতেই। আবার ভেতরে নিয়ে যাবে শিবুকে। তাতে শিবু যদি সাহসী হয় এবং ছোট-খাটো কিছু করে বসে তো করুক। কিন্তু তারপর সে শিবুকে শাসন করবে। কী ভালোই লাগবে তখন। অমন সাহসী মানুষটা তার সামনে তখন কী রকম যেন হয়ে যায়। উঃ দারুণ। ইচ্ছে হয়—না বাবা। থাক্ অত ইচ্ছায় কাজ নেই।

একটু পরে অপর্ণা রীতিমত হতাশ। চোরের মতো বের হয়ে এলো, শিবু নয়, সুখেন। ও আবার ওখানে ঢুকলো কেন অত চুপিচুপি। পুলিশ ওদের ফের তাড়া করল নাকি ? বিশ্বাস নেই। শিবু তার সামনে অমন লক্ষ্মী ছেলে হলে কি হবে, আসলে যে সে কী জিনিস চিনতে বাকী নেই। ওই বেপরোয়া ভাবখানাই অপর্ণার দেহ মনে ঝড় তুলতে শুরু

করেছিল কয়েক বছর আগে থেকে। শিবু যে তার বাবা কিংবা চন্দ্রমিস্ত্রির মতো মিনমিনে ভালোমানুষ নয়, একথা সে ভালোই জানে। তার আশা ভবিষ্যতে কোনোদিন ভালো হয়ে যাবে। বড় নেতাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখনি যদি সে ঢোঁড়া সাপ হয়ে যায়—ধুৎ ভাল্‌লাগবে না। ন্যাটা হাবুর মতো মানুষও শিবুকে পছন্দ করত। ন্যাটা হাবুও দারুণ ছিল। সে ভ্রূ কুঁচকে যখন তাকাতো, ঠিক সিনেমার হিরোর মতোদেখতে লাগতো। কিন্তু হলে কি হবে ? শিবুকে যে আগে থেকেই ভালো লেগে গিয়েছে। অপর্ণা জানলা থেকে সরে গেল। ঘরের কোণে একটা বড় জলচৌকির ওপর হারমোনিয়ামের বাক্‌সোটা। সেই হারমোনিয়াম বার করে একটু গলা সাধবে বলে তক্তাপোষের ওপর রাখতেই আবার ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জানলার আড়ালে দাঁড়ায়। এবারে নিশ্চয় শিবু আসবে।

একি! কে যেন ঢুকে গেল। লোকটার পেছনের একটা পা শুধু দেখতে পাওয়া গেল। তবে শিবু কথনই নয়। শিবুর প্যাণ্টের রঙ আলাদা। কিন্তু যে-ই ঢুক্‌ক, তারপরে সন্তর্পণে দরজাটা খুলে ঢুকলো প্যাণ্ট-সার্ট পরা শর্মিলা। শর্মিলা তার চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হবে। দুদিন আগে তো ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াতো। ফ্রক অবশ্য এখনকার অনেক মেয়েই পরে। শাড়ি কেনার ক্ষমতা শুধু তার বাবার মতো দু'একজনার আছে। দুতিন খানা শাড়ি আছে তার। সবাই প্রায় স্কার্ট ব্লাউজ পরে। কী করবে। এক বিয়ে হলে শাড়ি পায়। কজনারই বা বিয়ে হয় ? টুনুদি কত বয়স অবধি স্কার্ট ব্লাউজ পরে বেড়াতো। তবু বিয়ে হলো না। শেষে কোথায় চলে গেল। প্রমীলাদি দু'বছর আগে মরে পড়েছিল বাঁধাকপির ক্ষেতে। তাই নিয়ে কত বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি ওদিককার একশো পাঁচনম্বর বস্তির সঙ্গে।

শর্মিলার আগে কে ঢুকলো ? শিবু কথনই না। তবু অপর্ণার ইচ্ছা হয়। এতদিন সে ছিল একক নায়িকা। আজ ওই শর্মিলা, যে হাতে থালা

নিয়ে সবার বাড়িতে এটা ওটা চেয়ে বেড়ায়, সে এসে তাতে ছায়া ফেলল। ওই ঘরখানায় মিলিত হবার অধিকার শুধু শিবু আর তার। শেষে শর্মিলা এসে ভাগ বসালো!

অপর্ণার নাক দিয়ে ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস বের হয়। ইচ্ছে করলে মাকে ডেকে কিংবা হাঁকডাক করে শর্মিলা আর ওই লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারে। পরক্ষণেই কষ্ট হলো। না, সেটা ঠিক নয়। এই মুহূর্তটুকু শর্মিলার কাছে কত বড়। সে ভাবছে পৃথিবীতে সে রাজরানী। তার কতো কদর। বেচারা থাকুক। তবে আজেবাজে কিছু করে না বসে। লোকটাকে সে দেখতে পায় নি। লোকটা যদি শর্মিলাকে ভালো না বেসে ভালবাসার ফাঁদ পাতে?

ওরা যত দেরি করে, অপর্ণার দুর্ভাবনা তত বাড়তে থাকে। শেষে তার ভেতরটা আন্‌চান্‌ করে ওঠে। ধরা পড়বে না তো হারামজাদীটা? সময়ের জ্ঞান নেই কেন? অন্তত পনেরো মিনিট হয়ে গেল। এই মুহূর্তে শিবুও অভিপ্রেত নয় অপর্ণার কাছে। ওরা দুটো আগে বের হয়ে যাক। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে গেল। আগে শর্মিলা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যা বোঝার। একটু পরে, ওমা এ যে মানিক। ওর গোঁফ উঠেছে তো ভালো করে? অপর্ণা জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে একা একাই হাসতে থাকে। ওরা তাকে দেখতে পেলে ভীষণ লজ্জা পাবে। এতক্ষণে বোঝা গেল পাড়ায় নতুন নায়ক-নায়িকার উদয় হয়েছে। ওদের কাছে শিবু আর সে-ও পুরোনো।

ওদিকে সুখেন সন্ধে লাগতে না লাগতেই মাকে তাগাদা দিয়ে রুটি বানিয়ে নেয়। তারপর একটু রাত হতে সাততাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। তার হাব-ভাবে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে তার ছোট ভাইবোনেরা কেমন করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারা বরাবর একটু আলাদা আলাদা থাকে। দাদা যেন তাদের বাড়ির অতিথি। দাদা কী করে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে দাদা তাদের কখনো ধমকায় না বা মারে না। অবশ্য দাদার

কাছে অবদার করার সাহস তাদের নেই। দাদা নাকি লেখাপড়া জানে। ওরাও ভাই-বোনেরা টিফিনের লোভে কিছুদিন স্কুলে যাতায়াত করেছিল। তারপর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন বস্তিতে সামনের রাস্তায় খেলাধুলো করে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। রাস্তায় ময়লার গাড়ি চলে, অন্য গাড়িও চলে। বাসও চলতে শুরু করেছে। তার মধ্যেই ওরা খেলা করে। আর খেলা করে একগাদা কুকুর। কুকুর তো গাড়ির চাকার নীচে থেঁতলে পড়ে থাকে মাসের মধ্যে প্রায় দু তিনদিন। বাচ্চাদেরও দু'একজন যে মারা যায় নি তা নয়। তাই কিছুদূর পর পর রাস্তার ওপর বিন্ধ্যপর্বতের মতো স্পীড-ব্রেকার। যেন অগস্ত্য মুনি ফিরে আসবেন বলে গিয়েছেন। তাই মুনির হুকুম মতো ঘাড় নীচু করে অপেক্ষা করছে তারা। সেই সুযোগে গাড়ির পর গাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে। দামী প্রাইভেট কার চালাতে চালাতে গাড়ির মালিক এই হাম্পগুলোকে দেখে ঠাট্টা করে বলে —এগুলো হলো এক একটা 'বিপ্লব'। সমাজের এক একটা অপ্রয়োজনীয় বাচ্চা চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পিল্‌পিল্ করে বস্তির লোকেরা বার হয়ে এসে গাড়ি আটকে, কখনো তাতে আগুন দিয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। শেষে পথ অবরোধ করে দাবী তুলেছে স্পীড ব্রেকার চাই। কথা দিতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। ফলে রাস্তায় অতি ঘন ঘন গাড়ির গতির ছন্দপতন। এখন আর চোখ রাঙানোর দিন নেই। সব জায়গাতেই আপোষ। জনগণকে যদি ঠিকমতো সুযোগ সুবিধা না দিতে পার তাহলে চুরি জালিয়াতি করে যতই পয়সা জমাও, কাউকে ধমকাতে পারবে না। তোমরা জমি খরিদ কর, ফ্ল্যাট বানাও, ঠিকাদারী নিয়ে সরকারের পয়সা চুষে ভাগযোগ কর, যা কিছু কর— তোমাদের ঠেকাবার মতো অস্ত্র এখনো হাতে আসে নি। তবে ধমকানি চলবে না। আগুন জ্বলবে। চিরকাল সবাইকে পিলসুজ করে মাথার ওপর প্রদীপ হয়ে চেপে বসে মিটিমিটি হেসেছ আর মন ভুলিয়েছ। এখন হাসতে হলে পর্দার আড়ালে হাসতে হবে। সবার সামনে দাঁত বার করলে

দাঁত ভেঙে দেওয়া হবে। ইদানীংবস্তির অনেক ছেলেই পথ দুর্ঘটনার বলি হয়েছে। বারো বছরের হিসাব নিলে সাত-আটজন তো বটেই। সেই সঙ্গে কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগেও মরেছে দুজন। বস্তির কুকুরদের কোন্‌টার কখন যে মাথা বিগড়ে যায় ছেলেরা খেয়াল করে না। সবার চেনা কুকুর। দেখলে লেজ নাড়ে ঘন ঘন। একদিন দেখা গেল লেজ না নেড়ে লাল লাল চোখ নিয়ে ঘোরের মাথায় কামড়ে মাংস খুবলে নিল। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে বলে পেটে চোদ্দটা ইন্‌জেকসান নিতে হবে। কোথায় গিয়ে নিতে হবে তাও বলে দেয় ডাক্তার। আজকাল সবাই গিয়ে দিয়ে আসে। কারণ চন্দ্রমিস্ত্রির ভাই আর প্রাণগোবিন্দের অতবড় ছেলেটা জলাতঙ্ক রোগে মারা গিয়েছিল। ওরা ইন্‌জেকসান নেয় নি। প্রাণগোবিন্দের ছোট ছেলে বকুকেও কামড়ে ছিল কুকুর। ইনজেকসান নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

সুখেন খেয়ে দেয়ে একদিকে চুপ করে পড়ে থাকে। ওর ভাইবোনেরা মেঝেতে চাটাই-এর ওপর পরপর শুয়ে পড়ে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকাতরে ঘুম। সারাদিন ঘুরে ফিরে ওরা ক্লান্ত থাকে। ওদের বাবা রাতে বাড়ি থাকে না। বউবাজারে কতকগুলো গয়নার দোকান পাহারা দেবার জন্য লোক ঠিক করা আছে, ওদের বাবা তাদের একজন। রাতের পর রাত এই কাজ করে চলেছে। দিনের বেলায় এসে খেয়ে দেয়ে দুপুরে ঘুমিয়ে নেয়। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই খেয়ে নিয়ে রওনা দেয়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিশেষ কথা হয় না। তবু তারা বাবার কাছে যায়। কথা বলে। আবদার করে দুএকটা জিনিসও আনতে বলে। বাবা মাঝে মাঝে এনেও দেয়। কিন্তু সুখেনের সঙ্গে বাবার দেখা হয়ে ওঠে না। সে যে ন্যাটা-হাবুর দলে যোগ দিয়েছে সেই খবর রাখে। সে যে বোমা বানাতে ওস্তাদ তাও অজানা নেই। কিন্তু কিছু বলতে পারে না ছেলেকে। নিজেই যেন সে কতবড় অপরাধী। কারণ এই ছেলেকে সে গল্প করেছে, এককালে তাদের নিজেদের বাড়ি ছিল এক দেশের গাঁয়ে, পুকুরও ছিল। সুখেন স্বপ্নালু

চোখে বাবাকে কতবার বলেছে সেখানে নিয়ে যেতে। বাবা নিয়ে যেতে পারে নি। শুধু স্বপ্ন দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে সুখেনের স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছে। বাবার প্রতি অবিশ্বাস আর বিরক্তির এক একটা স্ফটিক জমতে জমতে পুঞ্জীভূত হয়েছে। বাবা সেটা অনুভব করেছে। তাই ছেলে ঢ্যাঙা হয়ে উঠতে, তার নাকের নীচে জোড়া অতি পাতলা গোঁফ উঁকি দিতে, ছেলের চোখের দিকে একদৃষ্টে আর চাইতে পারত না। এখনো পারে না।

মা ঠিক বুঝতে পারে ছেলে আজ একটু অন্য রকম। কুপীর আলোয় চালের কাঁকর বাছতে বাছতে বলে—তোর কি হয়েছে রে খোকা?

—কি আবার হবে?

—পুলিশ আসবে বুঝি?

—পুলিশ আসতে যাবে কেন?

—মনে হচ্ছে তুই সোয়াস্তি পাচ্ছিস না।

—সব ঠিক আছে। আমি অনেক রাতে একটু বাইরে যাব।

কুপীর আলোয় মায়ের চোখের তারায় অদ্ভুত বিভীষিকার ছায়া ফুটে ওঠে। বলে—না, তুই যাবি না।

—আমার দরকার আছে।

মা একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠে—না।

—আঃ মা। আস্তে। কেউ শুনতে পাবে।

মা কেঁদে ফেলে বলে—আর কতদিন এই আতঙ্ক নিয়ে থাকব। কত ছেলেই তো আছে। কয়জন আর চাকরী করে। তবু ঘরে থাকে তারা। পুলিশের তাড়া খায় না।

—তুমি থামবে মা?

—থেমেই তো আছি। আর পারি না। ভগবান আমার কপালে শান্তি দিলেন না।

—ভগবান? সেটা আবার কে?

—অলক্ষুণে কথা বলিস না। চন্দ্রসূর্য উঠছে এখনো। অমঙ্গল হবে।

সুখেন বুঝতে পারে, মা সারারাত উস্‌খুস্‌ করবে। এখুনি একটা ফয়-সালা করে ফেলা দরকার।

সে বলে—আমাকে রাতে বেরোতে হবে। মনে হয় শেষ রাত নাগাদ পুলিশ আসবে। সেই রকম খবর পেয়েছি।

—তবে যে বললি পুলিশ আসবে না ?

—আস্তে। অত চেঁচিয়ে কথা বলছো কেন ? বলছি পুলিশ আসলেও আসতে পারে। আসবেই এমন কোনো কথা নেই।

মা যেন পাথর হয়ে যায়। স্থির হয়ে বসে থাকে। এতক্ষণ যে হাত চালের কাঁকর বাছছিল সেই হাতও অনড়।

সুখেন বলে—আমি একটু রাত হলেই বেরিয়ে যাব।

—সামনের ওই পুলিশগুলো ধরবে না ?

—আমি সামনে দিয়ে গেলে তো ?

সুখেন জানে মা আর কিছু বলবে না। সে একটু দেরি করে বেরুবে। এই মুহূর্তে বাইরে গেলে কারও না কারো চোখে পড়ে যেতে পারে। সে চায় না শিবু, নিউটন, হাকুরাও কিছু জানুক। তারা তার একক অভিযানের ব্যাপারে অন্ধকারেই থাক।

দেঁতো কাশীকে ফস্‌কাবার পর থেকে একটা দুঃসহ জ্বালায় সে অবিরত জ্বলছে। শিবুর মন্তব্য সহনীয় হলেও মানিকের মতো ছেলে খোঁচা দেয়। অসহ্য। তাই সে কদিন ধরে একটা ছেলেকে লাগিয়েছে দেঁতোর গতি-বিধির ব্যাপারে। ছেলেটা একই পাড়ার। কোনো পার্টির নয়। গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। তার ওপর কারও বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সেও-জানে না যে সুখেন দেঁতো কাশীকে একেবারে খতম করতে চায়। সুখেন যে অতবড় ওস্তাদ তার ধারণাই নেই। ছেলেটার সঙ্গে সে একই ক্লাশে পড়ত ছেলেবেলায়। তার বাবা বাজারের ফুটপাথে ডিম বিক্রি করে। বাবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে ছেলেটি নিজেই বসে যায় বাবার জায়গায়।

অন্য সময় টুকটাক খবর চালাচালি করে। সুখেন কোন্ পার্টির তার ধারণা নেই। তবে দেঁতো কাশীকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। পাড়ার মস্তান। ছেলেটির কাছ থেকে সুখেন জানতে পারে যে দেঁতোর পেছনে পেছনে একটু দূরে থেকে একজন সব সময় পিস্তল নিয়ে তাকে কভার করে। সেই বডিগার্ডের নাম জানতে পারে নি সুখেন। তবে চেহারার বর্ণনা পেয়েছে। এছাড়া দেঁতো কাশী কোন্ সময় কোথায় থাকে, বিশেষত সন্ধ্যার পরে, মোটামুটি জানতে পারে। দেঁতো ঘরে না ফিরলে কোথায় থাকে সে সম্বন্ধেও পাকা খবর পেয়ে যায়।

আজ সুখেনের অভিযান। দেঁতো কাশী যদি বর্ণনা মতো আজ রাতে সেই ঝুপড়িতে পড়ে থাকে মদ গিলে তাহলে নিস্তার নেই। তবে ওর বডি-গার্ড নাকি মদ স্পর্শ করে না। রাতে ঘুমোয় না। দিনের বেলা ছয়' ঘণ্টা তার ঘুমের বরাদ্দ। এইটাই অসুবিধা। তবু চেষ্টা করতে হবে। আজ না হোক আর একদিন।

ঝিঁ ঝি ডাকছে বোধহয় ঘরের কোণা থেকে। দূরে পট্ পট্ শব্দ। অচেনা লোক ভাববে বুঝি পাইপ গান চলছে। আসলে কোথাও কোনো আব-র্জনার স্তূপে আগুন লাগানো হয়েছে। ওই আগুন বিস্তারের সম্ভাবনা নেই।

সুখেন উঠে পড়ে। মা শুয়ে পড়লেও বুঝতে পারে ছেলে উঠেছে দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে। নইলে কুকুর ঢুকে হাঁড়ি চাটে। মা উঠে পড়ে। মনে মনে ডাকে দুর্গা দুর্গা। ছেলে ওসব নাম সহ্য করতে পারে না। অথচ আগে কী ভক্তিই না ছিল ঠাকুর দেবতার ওপর। সব গিয়েছে। ভগবানের ওপর অভিমান কিনা কে জানে। মনে তো হয় না। যে কটা পাটপাট শুয়ে ঘুমোচ্ছে তাদেরও বোধহয় বিশ্বাস চলে যাবে বড় হয়ে উঠতে উঠতে।

—কখন ফিরবি ? মা জিজ্ঞাসা করে।

—বলতে পারছি না। পুলিশ না এলে, সকালে।

সুখেন একবার মায়ের অর্ধাহার আর অতি পরিশ্রমে ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে এগিকে যায়। করালীর ঘরের দিকে যেতে এক গাদা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। শালার কুকুরগুলোর জন্মনিয়ন্ত্রণ দরকার। বেড়েই চলেছে। ওকে সব কটা কুকুরই চেনে। দূর থেকে চিনতে পেরে কয়েকটা চুপও করে যায়। আর ওই পাট্‌কেলে ঙের রটা অতি আনন্দে আকাশের দিকে মুখ তুলে খাম্বাজ রাগিণীতে গলা সেধে নেয়।

বস্তি নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমোচ্ছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম। শুধু যাদের পেটের মধ্যে জ্বলুনি আছে, তারা এপাশ ওপাশ করছে। তারা রাতে দু-একবার উঠে জল খেয়ে নেয় ঢক্‌ ঢক্‌ করে। আর কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে যারা হাঁপানির টানে ঘুমোতে পারে না। অনেকে বুকে একগাদা শ্লেষ্মা নিয়ে খক্‌ খক্‌ করে। তারা কুকুরের চিৎকারকে ভ্রূক্ষেপ করে না। ঘরে লোক ঢুকলেও তাদের এসে যায় না। লোক বলতে তো চোর। নেবে কি? তবু কুকুর ডাকলে অনেকের সজাগ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। শিবুদের দলের তো বটেই। পুলিশের ভয়ে। অপোজিট পার্টির ভয়ে।

ধীরে ধীরে করালীর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সুখেন। ক্যাঁচ করে শব্দ হলেও অত রাতে অপর্ণার ঘুম ভাঙলো না। সে তখন হাসি হাসি মুখে সুখস্বপ্ন দেখছে। চারটে বোমা .তঁতুলের হাঁড়ির ভেতর থেকে বার করে নিয়ে সন্তর্পণে একটা পলিথিনের থলের মধ্যে রাখে সুখেন। তারপর রওনা দেয় দেঁতো কাশীর আস্তানার দিকে। সামনের রাস্তায় পুলিশ পিকেট। পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায় সে।

কত রাত কে জানে? শিবুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো দরজায় কে যেন ধাক্কা দিলো। পুলিশ এলো নাকি? বেশ কিছুদিন পরে আজ সে নিজের বিছানায় শুয়েছে। পাশের একটু বড় ঘরে তার বাবা আর ভাই ঘুমোচ্ছে। মা অনেকদিন নেই।

আবার শব্দ। পুলিশের শব্দ নয়। কে যেন ধাক্কা দেবার চেষ্টা করছে। শিবু তার পিস্তলটা' বাগিয়ে নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করে—কে?

অস্পষ্ট স্বরে কেউ বলে—আমি।

কে যেন দরজায় ঠেস দিয়েছে। শিবু খিল খুলে ফেলে।

সুখেন বসে রয়েছে। রক্তাক্ত সুখেন। শিবু বিদ্যুৎ গতিতে ভেতর থেকে টর্চ নিয়ে এসে ওর গায়ে মুখে আলো ফেলে। জামা রক্তে ভিজে সপ্-সপে, মুখ ফ্যাকাশে।

—এ কি করেছিস সুখেন। কে করল তোর এ দশা।

—দেঁতোর বডিগার্ড। কাঁধের নীচে লেগেছে। তোরা পালা।

—কেন? পালাব মানে? এখনি যাব। দেখি শালার—

সুখেনের কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। অনেক রক্ত বের হয়েছে। সে জ্ঞান হারাবে বলে মনে হচ্ছে।

কোনোরকমে সে বলে—দেঁতোকে খতম করেছি। তোরা পালা।

সুখেন দরজার চৌকাঠের ওপর এলিয়ে পড়ে।

মুহূর্তের জন্য হাবু দিশেহারা হয়ে যায়। দেঁতোকে মেরে এসেছে? বলছে কি সুখেন? কেন গেল একা একা। একটু বললে পারত। কিন্তু ওসব ভেবে লাভ নেই। এই মুহূর্তে সুখেনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সে মানিককে ডেকে নিউটনদের খবর দিতে বলে। আর নিজে ছোটে শেতলের ঘরে।

শেতলও শুনেই বলে—এখুনি সুখেনকে পেছন দিক দিয়ে বয়ে নিয়ে যা। দাঁড়া আমি টাকা দিচ্ছি। ট্যাক্সি পেলে খুবই ভালো। হাসপাতালে দিতে হবে।

—ধরা পড়বে।

—মরে যাওয়ার চেয়ে ধরা পড়া ভালো।

শেতল টাকা বের করে দেয়। শিবুর কাছেও কিছু টাকা আছে। হারুর

কাছে কখনই কিছু পাওয়া যায় না। সে ফুঁকে দেয় সব। মানিক নিউটন দু'চার টাকা দিলেও দিতে পারে।

—কোন্ হাসপাতালে নেব ?

—ন্যাশানাল। সবচেয়ে কাছে। ডাক্তারকে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে কেটে পড়বি। সেঁতো সত্যি মরলে পুলিশ এখানে হানা দেবে। বুঝতে পারছি আমাকেও ছাড়বে না।

সুখেন যে গুলি খেয়ে ভীষণ জখম হয়েছে, ভোর হতে না হতেই বস্তির সবাই জানলো। আজ সুখেনের মায়ের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ নতুন লাগানো ফুলকপির ক্ষেতের ওপর দিয়ে বহুদূর ভেসে চলল। অমন কত কান্না ভেসে যায় অসংখ্য মশা-মাছির মতো। সবাই শুনেছে সুখেনের জামা রক্তে একেবারে ভেসে গিয়েছে। শিবুদের চৌকাঠে রক্ত রয়েছে শুনে অনেকে দেখেও গেল। ওরা শুনলো, সুখেনের মন ভালো ছিল না। শুনলো, হাবুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে সে একা।

আলতাফ যথারীতি ভোর বেলা চায়ের দোকান খুলেছে। উনোনে আঁচ দিয়েছে। জলের পাত্র বসানো হয়ে গিয়েছে। পুলিশ পিকেটের লোকেরা সারা রাত মশার কামড় খেয়ে গা ফুলিয়ে আলতাফের ঝাঁপখোলা দেখে গুটি গুটি এগিয়ে আসে। বেঞ্চিটার ওপর বসে।

একজন আলতাফকে জিজ্ঞাসা করে—এত সকালে কাঁদে কে ?

আলতাফ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে—এতবড় বস্তি। কে কোথায় কাঁদছে বলব কি করে ?

আলতাফ সবে ছোট ছোট কাঁচের গ্লাস পরপর সাজিয়ে গরম জল দিয়ে ধুয়েছে এমন সময় একটা ওয়্যারলেস ভ্যান গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে পিকেটের ইন-চার্জকে কাছে ডাকে।

—ও. সি. আর বড়সাহেব এখনি আসছেন। কিছু লোককে তোলা হবে এখান থেকে।

—ইনচার্জ অবাক হয়ে বলে—কেন ! কেন এখানে তো কিছু হয় নি !

—খুন হয়েছে। জোড়া খুনও হতে পারে।

—এখানে খুন হয়েছে? তাই কান্না শুনতে পাচ্ছি। আপনি শুনছেন না?

—আরে কী মুশকিল। এখানে খুন হয়েছে কে বলল? অন্য পাড়ায় হয়েছে। এখানকার কেউ করেছে বোধহয়। আপনারা এ্যালার্ট থাকুন। ওয়্যারলেস ওই রাস্তার ওপর হাম্প বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আপ এ্যাণ্ড ডাউন পেট্রল দিতে শুরু করল। আর আলতাফ ব্যাপার গুরুতর দেখে নেংড়া শেতলের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিলো।

শেতল এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল। সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে। পুলিশ আসবে। সুখেনের মাকে অন্য কারও ঘরে গিয়ে বসে থাকতে বলেছে। কারণ তার চোখের জল ঝরেই যাচ্ছে। তারা ঠিক করে, পুলিশ যদি শিবুদের কথা জিজ্ঞাসা করে তবে বাড়ির লোকজন বলবে ওয়্যারলেস ভ্যানকে পেট্রোল দিতে দেখে ওরা ভয়ে পালিয়েছে, রাতে বাড়িতে ছিল।

এরপর শেতল আলতাফের দোকানের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। বলে—দে, এক কাপ কড়া করে চা বানা দেখি। এবারে মনে হচ্ছে আমার আর এক ঠ্যাং-ও যাবে।

এতক্ষণ পিকেটের পুলিশদের চাহনির মধ্যে একটা বন্ধুত্বের ভাব ছিল, ওয়্যারলেস আসার পর সেই চাহনিতে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। শেতল চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে দুএকবার ঠোঁট ঠেকিয়ে গুটি গুটি পিকেটের কাছে গিয়ে বলে—আপনাদের চা এখানে নিয়ে আসবে?

—না বাবা, চায়ের দরকার নেই। রিলিভের টাইম হয়ে গিয়েছে। যত সব ঝুট্ ঝামেলা।

শেতল রিলিভের ব্যাপারটা জানে। অনেক মিশেছে পুলিশের সঙ্গে। সে বলে—এখন তো মোটে ছ'টা বাজে। আপনাদের রিলিভ আসবে লালবাজার থেকে। দেরি হবে।

—কে বলল, লালবাজার থেকে আসবে? সোজা ব্যাটেলিয়ান থেকে

আসবে।

—ওই একই কথা। উনিশ আর বিশ। আসুন চা খেয়ে নিন।

ইন্-চার্জ চটে গিয়ে বলে—যান্ তো মশায় এখান থেকে।

শেতল শীতল ভাষায় বলে—আলতাফ যে আপনাদের জন্যে চা তৈরি করছে।

—ওকে বলে দিন, আমরা চা খাবো না।

সেই সময় দূরে একটা লাল সাদা জীপ দেখা গেল। সবাই বুঝলো বড়-বাবু আসছে। শেতল পিকেটের কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

ও.সি.র পেছনে একটা বড় ট্রাক ভর্তি সিপাই। তার পেছনে কালো রঙের আর একখানা জীপ। শেতল বুঝলো বড়সাহেবও আসছে। খেলা জমেছে ভালো।

ও.সি. সোজা এসে বলে—এই যে শীতল এখানে কি করছ?

—ওরা চা খাবেন কিনা জানতে চাইছিলাম।

—আর ঢং করতে হবে না। কে মেরেছে কাশীকে?

—কাশী? মরেছে? আপনি কি বলছেন স্যার?

ইতিমধ্যে বড়সাহেব এসে শেতলকে দেখে চিৎকার করে ওঠে—এই হারা-মজাদাই পালের গোদা। তোলো এটাকে।

ও. সি. হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে—দাঁড়ান স্যার।

ট্রাক ভর্তি ফোর্স বস্তির চারদিকে পোস্ট করে দেওয়া হয়। বস্তিটা যেন ইডেন গার্ডেন্স্। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। চারদিকে সেইভাবে পুলিশকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। কোথাও শশার মাচা, কোথাও উচ্ছের বেড়া, কোথাও কলাগাছে মোচা ঝুলে আছে বাঁশ দিয়ে ঠেক্না দেওয়া, কোথাও খাটা পায়খানা, কোথাও বাচ্চাদের হাগার জন্যে টানা নর্দমা। সব জায়গাতেই পুলিশ। কোম্বিং অপারেশান শুরু হবে।

এ সি. কিন্তু নেংড়া শেতলের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। রক্তবর্ণ চোখে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় তার দিকে—কে মারলো দেঁতো কাশীকে?

শেতল শুরু করে—দেখুন মেজবাবু—

—আমি বড় সাহেব।

—ওই একই কথা। আপনাদের বড়সাহেব ছিলেন আবু হায়দার। মনে আছে তাঁর কথা? আমি তো সরকারের বিরুদ্ধে ছিলাম। তবু তাঁকেমান্য করতাম। কী গম্ভীর। যা কিছু করার নিজে করতেন। কথায় কথায় কণ্ট্রোল থেকে অর্ডার নিতেন না। আর আপনি? অল্প জলের পুঁটি মাছ।

—কী? কী বললি? এই শ্যামাপদ—

শ্যামাপদ হলো এ. সি. সাহেবের গার্ড। হাতে বড়সাহেবের হাফ লাঠি আর হেলমেট। কোমরে রিভলভার। সে ছুটে আসে।

—ধরো ওকে। ধরে ট্রাকে উঠিয়ে দাও।

শ্যামাপদ তাড়াতাড়ি বড়সাহেবের জীপে লাঠি আর হেলমেট রাখতে ছুটলো।

—কোথায় চললে?

—এগুলো সব রেখে আসি স্যার।

—ধেৎ, অপদার্থ।

শেতল ঠাণ্ডা মাথায় বলে—ওসব করতে যাবেন না। আবার আগুন জ্বলবে। দেঁতো কাশীর কি হয়েছে বলুন।

—তুমি জানো না বলতে চাও?

—জানলে জিজ্ঞাসা করব কেন?

—বোমা মেরে তার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যে ছেলেটা থাকে তারও একটা হাত উড়ে গিয়েছে। বাঁচবে না।

—খুব ভালো খবর। আনন্দের খবর। কিন্তু কে মারল?

—ন্যাকামী হচ্ছে? জান না যেন। হোম মিনিস্টার নিজে ফোন করেছেন কমিশনার সাহেবকে। এবারে বুঝবে ঠেলা। এই শ্যামাপদ—

শেতল বলে—আমাকে গাড়িতে তুলতে অত তোড়জোড়ের দরকার

নেই। আমি পালাতে পারব না। আমি ওই চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে বসছি। আপনাদের কাজ শেষ হোক, তখন তুলবেন আমাকে। নেংড়া শেতল হাতের চায়ের গ্লাসটা নিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে আলতাফের দোকানের বেঞ্চিতে বসে। তার সঙ্গে সঙ্গে এ. সি.র গার্ড শ্যামাপদ গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

শেতল ভ্রূ কুঁচকে বলে—আরে আপনি আমার বডিগার্ড নাকি? বড়-সাহেবের কাছে যান। ঢিল খেয়ে তার মাথা ফাটলে আপনার চাকরী যাবে।

শ্যামাপদ বলে—যাক্ চাকরী। তবে বড়সাহেব ঢিল খেলে তোমার মাথা আস্ত রেখে যাব না। আমার নাম শ্যামাপদ কীর্তনীয়া। নামটা মনে রেখো। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এই থানায় যদি পোস্টিং কখনো পাই সব সাহেবকে ছেড়ে আমার পায়ে তেল মালিশ করতে হবে।

শেতল অবাক হয়ে তাকায়। সাংঘাতিক লোক তো। পিলে চমকানো কথা বলে। বুঝতে পারে, সাচ্চা লোক যোগাড় করেছে বড়সাহেব। মুখে শেতল বলে—তবে দাঁড়িয়ে থাকুন। ইচ্ছে করলে এক পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারেন। সেটা ব্যথা হয়ে গেলে অন্য পায়ে দাঁড়াবেন।

—ঠিক আছে। তবে তোমার এক পা তো সুবিধের না। একটু সুযোগ পেলেই আর এক পায়ে দাঁড়ানোর সাধ ঘুচিয়ে দিয়ে যাব আজ তোমার। আমার নামটা মনে আছে তো। একশো আটবার করে জপ করো। ভাবছি আমিই বড়সাহেবের মাথাটা ফাটিয়ে দেবো কিনা তাহলে একটা মওকা পাবো।

বস্তির ভেতরে চেঁচামেচি শোনা যায়। নেংড়া শেতল অস্থির হয়ে ওঠে। অত্যাচার চালাচ্ছে না তো পুলিশ?

সে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে যাবার চেষ্টা করতেই শ্যামাপদ বলে ওঠে —উঁহুঁ, ওটি চলবে না। বসে থাকো।

—চুপ করুন। বাড়ির মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে শুনছেন না?

আপনারা সব পারেন।

শেতল এগিয়ে যেতেই শ্যামাপদ তার হাত চেপে ধরে।

শেতলের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। বলে—পারবেন আমার হাত ধরে রাখতে ? আমি খোঁড়া, কিন্তু এই দেখুন—

শেতল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বস্তির একটা ছেলেকে ডেকে বলে—ভেতরে পুলিশ কি করছে চট করে দেখে আয় তো ! যদি শুনিস পুলিশ কারও গায়ে হাত দিয়েছে, এসে আমাকে বলবি।

শেতল গজরাতে গজরাতে গিয়ে বেঞ্চিতে আবার বসে। ছেলেটি একটু পরে ফিরে এসে খবর দেয় যে কারও গায়ে পুলিশ হাত দেয় নি।

—কি করছে পুলিশ ?

—সবার ঘর দেখছে। অপর্ণাদিকে কী যেন বলেছে। অপর্ণাদি খুব কাঁদছে। তার বাবাও দেখলাম অপর্ণাদির ওপর ফায়ার।

ইতিমধ্যে ও সি. দলবল নিয়ে শেতলের সামনে এসে বলে—কোথায় পাচার করলে ওদের শেতল।

—ব্যাপারটা হেঁয়ালীই রেখে দিলেন বড়বাবু। আপনি এসে জানতে চাইলেন, কে মেরেছে দেঁতো কাশীকে। বড়সাহেবও এসে তাই জানতে চাইলেন। উনি বললেন, দেঁতো কাশীকে মেরে ফেলেছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে একে একে দুই করে ফেললেন।

—প্রমাণও পেলাম। ওরা সব উধাও।

—সবাই ছিল। আপনাদের এক ওয়্যারলেশ ভ্যান এসে পিকেটকে কি বলল, আর পিকেটের লোকেরা চায়ের দোকান ছেড়ে তাড়াতাড়ি ওদের জায়গায় ফিরে গিয়ে রাইফেল আঁকড়ে ধরে বসল। শিবুদের সন্দেহ হলো। হবেই তো। দেখলাম ওরা পেছনের দিক দিয়ে বের হয়ে গেল।

—বের হয়ে গেল ? কখন ?

—ভ্যানটা এসেছিল পৌনে ছটা নাগাদ। তারপরই—

—সবাই ছিল।

—আমি প্রত্যেককে আলাদা ভাবে দেখি নি। তবে মনেহয় সবাই ছিল। ঘোত্‌না আর মানিক বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। ওরা ঘুম চোখেই দৌড়েছে।

—হুঁ। অসুবিধা কি জান? তুমি যতটা ক্যাবলার মতো বলছ, আমি অতটা ক্যাবলার মতো বিশ্বাস করবো না।

—ভালোতো। দেঁতো কাশী মরেছে, এ খবর আপনি প্রথম দিলেন। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

বড়বাবু এ. সির কাছে যেতেই এ সি প্রশ্ন করে—কি হলো?

—একটাকেও পেলাম না। ওরা ছাড়া আর কে মারবে বুঝছি না। তবে ভেতরের খবর পেয়েছি, ওরা ভোরবেলার দিকেও ছিল।

—কে বলল?

—তার নাম বলব না। শুনলাম ওরা ছোটাছুটি করছিল। বোধহয় আমরা আসব জানতে পেরেছে। কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে দেঁতোকে সরিয়ে দিলো। আমার মনে হয় বীরেন বটব্যালকে ট্যাপ করা যেতে পারে। আসলে গোড়ায় তো এদিকে বীরেন, আর ওদিকে অবিনাশ।

—ঠিক। ও কিন্তু আবার আমাদের উড্-হ্যাভ-বিন্ মুখ্যমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ।

—জানি। তবে অতসব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হলে চাকরী ছেড়ে ব্যাঘ্র-প্রকল্পে গিয়ে বাসা বাঁধতে হয়।

এ. সি সাহেব একটু কড়া চোখে ও. সির দিকে তাকালেও ও. সি ভ্রূক্ষেপ করে না।

বীরেন বটব্যালের কথা বলতেনা বলতেই গাড়ি করে সে এসে হাজির। ও. সি. স্বগতোক্তি করে—ব্যাটা সহজে মরবে না।

এ সি. হেসে ফেলে।

শেতল বুঝতে পারে শিবুদের কেউ বীরেনবাবুকে খবর দিয়েছে। ভালো কাজ করেছে।

বীরেনবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বড় সাহেবকে বলে—কি মশায়। শুনলাম

এখানে এসে আপনারা বস্তি ঘেরাও করেছেন। কী ব্যাপার বলুন তো? সেদিন শীতল চৌধুরীর সঙ্গে কথার পর এমন হওয়া উচিত নয়। ওই তো দেখছি শেতলবাবু—

ও. সি. বলে—আপনি এত তাড়াতাড়ি খবর পেলেন কি করে?

—কেন? শিবুরা গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিলো। ওরা পালালো। আপনারা আসছেন, ওরা জানতে পেরেছে। কী ব্যাপার? কী হয়েছে? বীরেনবাবুর গঠনমূলক কর্মক্ষমতা যত কমই থাকুক না কেন, ঝানু রাজনীতিবিদের মতো দরকার বুঝলে মুখখানাকে ভাজা মাছ উল্টে না খাবার মতো করে রাখতে পারে।

ও. সি. পর্যন্ত তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অন্তরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে বলে—দেঁতো কাশী খুন হয়েছে।

—এঁ্যা! তাই নাকি? আমার পক্ষে খবরটা ভালোই। হিস্যার গণ্ডগোল মশাই। আসলে তো সমাজবিরোধী। ভালোই হয়েছে, কি বলেন?

—ঠিকই বলেছেন। ন্যাটা হাবু, দেঁতো, শিবু এরা যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় ততই মঙ্গল। কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা রক্তে যে সহস্র সহস্র রক্তবীজের ঝাড় জন্মাচ্ছে সেটা কে ঠেকায়?

এ.সি. ও সি কে বলে—দেঁতো কাশী আর হাবুদের এক পর্যায়েফেলবেন না। কাশীর অনেক অবদান আছে।

বীরেনবাবু বিদ্রূপ করে বলে—তা যা বলেছেন। দারুণ অবদান। তাই হাবু মারা গেলে হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। পারলে ওর দলবলকেই গ্রেপ্তার করতেন। অথচ দেঁতো খুন হতেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন বেচারাদের তুলে নিতে। পা চাটার একটা সীমা আছে মশায়।

এই সময় নেংড়া শেতল বীরেনবাবুকে ডেকে বলে—দেখুন, এ. সি. সাহেব আমার সামনে পেয়াদা খাড়া করে রেখেছেন। উঠতেও দিচ্ছে না।

ও. সি. অবাক হয়। বীরেনবাবুও আশ্চর্য না হয়েপারে না। শেতল তো

প্রতিবন্ধী।

বীরেনবাবুও ও. সি.কে বলে—কি মশায়। ওই অক্ষম মানুষটা শেষে আপনাদের বাড়া ভাতে ছাই দিলো?

ও. সি. ঠিক বুঝতে পারে না। সে দেখতে পায় এ. সি.র গার্ড শেতলের পাশে ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ. সি. তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা খোলসা করতে গিয়ে বলে—সার্চ করার সময় আমিই বলেছিলাম শেতলকে আটকে রাখতে। নইলে ভেতরে গিয়ে হুজ্জতি করত। লোকটাকে বিশ্বাস নেই।

ও. সি মুখ বিকৃত করে বলে—কী আর করত। আমার সঙ্গে অনেক ফোর্স ছিল।

শ্যামাপদকে ডেকে নেয় এ. সি.।

নেংড়া শেতল এবারে কাছে এসে বলে—সতীশ ড্রাইভারের মেয়ের গায়ে হাত পড়েছে শুনলাম?

ও. সি. ধমকের স্বরে বলে—মিথ্যে কথা বলে ঝামেলা পাকিও না শেতল। শেতলও গরম হয়ে উঠে চেঁচায়—আমি মিথ্যে কথা বলছি? ডাকুন সতীশ ড্রাইভারকে।

—ওকে ডাকতে হবে না। ওর মেয়ে কেঁদে ফেলেছিল শিবুর কথা জিজ্ঞাসা করায়।

—ওর মেয়েকে শিবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলেন কেন?

—তুজনের মধ্যে যে এখন পীরিতি রয়েছে—খবর রাখো না? একসঙ্গে সিনেমায় যায়, রেস্টুরেণ্টে খায়। ওকে জিজ্ঞাসা করগে। ওর বাপ্ ওকে ধরে ঠেঙাচ্ছে এতক্ষণে।

নেংড়া শেতল একটু বোকা হয়ে যায়। ও. সি. লোকটা ফালতু নয়। না জেনে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার পাত্র নয়। শিবুটা নিশ্চয় অপর্ণাকে গেঁথেছে। ভালোই করেছে। মেয়েটা দেখতে বেশ। অনেকটা চন্দনা চন্দনা লাগে। কিন্তু শিবুর কথা অপর্ণা বলে দেয় নি তো?

ও. সি.কে সে বলে—আপনাদের পুলিশের যে কী খবর—মাথামুণ্ডু নেই।
শিবুর কথা অপর্ণা জানবে কি করে ?

—খুব জানে। তবে এই মুহূর্তে কোথায় আছে জানে না বোধহয়। ওর বাপকে যখন শিবুর সঙ্গে ঘোরাফেরার কথা বললাম, ও ঘাবড়ে গিয়ে চোখ কপালে তুলে আর একটু হলে অজ্ঞান হয়ে যেতো। তবে মেয়েটা ভালো। যতদূর জানি, সে চায় না শিবু এসব করুক।

শেতল তাজ্জব বনে যায় ও. সি.র খবর সংগ্রহের ক্ষমতা দেখে। ভালো ইনফরমার যোগাড় করেছে। কে সেই ইনফরমার ?

বীরেনবাবু নাক কুঁচকে বলে—আপনারা মানুষের সেণ্টিমেণ্টের দাম দেন না। মান-সম্মান রাখারও দরকার মনে করেন না। অদ্ভুত জীব আপনারা।

—এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছেন বীরেনবাবু। আমাদের অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে হয়। সভ্যভব্য সব সময় থাকতে পারি না। তাই বলে আপনারা যারা রাজনীতি করেন তাঁদের কাছে আমরা শিশু। আপনাদের হাতে যদি আমাদের মতো একটা করে হাফ-লাঠি ধরিয়ে দেওয়া যেতো তাহলে আমাদের চেয়েও হিংস্র দেখতে লাগত। তবে হ্যাঁ, আমরা সোজাসুজি ধমকাই আর আপনারা মিষ্টি হেসে হেসে সর্বনাশ করেন।

নেংড়া শেতল বুঝতে পারে না বীরেন বটব্যাল সুখেনের খবর রাখে কিনা। হয়তো রাখে। তবে পুলিশ এখনো জানেনা, এটা ঠিক। জানলে ওদের চেহারা কথাবার্তা মুহূর্তে পাল্টে যেতো। পুলিশ জানবে ঠিকই এবং শিগ্গির জানবে। হাসপাতাল থেকে খবর যায় ওদের কাছে।

এ.সি. বলে—আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনাকে শিবুরা তো খবর দিয়েছিল ?

—হ্যাঁ। বললাম তো।

—ওরা কে কে ছিল ? নামগুলো বলুন না।

—আমাকে জেরা করছেন নাকি ?

—না না, জেরা করতে যাব কেন ?

ও. সি. বাধা দিয়ে একটু কঠিনস্বরে বলে—জেরা করতে হতে পারে বৈকি আপনাকে। দেঁতো কাশীর বিপক্ষের লোক আপনি। তাকে আপনার লোকেরা খুন করেছে ধরে নিতে হবে। আর খুন করে পালাবার সময় আপনাকে খবর দিয়ে পালিয়েছে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য।

বীরেনবাবু রেগে গিয়ে বলে—কখনই না। তারা রাতে বস্তিতে ছিল।

—প্রমাণ-সাপেক্ষ। বরং বড়সাহেব যা জানতে চাইছেন, বলে ফেলুন। কে কে গিয়েছিল ?

—ওরা কোনো বিপদে পড়ে আমি তা চাই না। তাই কিছু বলব না। আপনারা নির্লজ্জের মতো একপেশে কাজ করেন।

ও সি. একটু হাসে। মনে মনে ভাবে, এই বটব্যাল ব্যাটাকে কোনো-রকমে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। বড্ড জ্বালাচ্ছে। নাকে দড়ি দিয়ে একটু ঘোরালে ভবিষ্যতে সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে।

দুপুরে বীরেনবাবু শিবুদের খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থাই করেছিল। নিজের বাড়িতে করতে পারে নি। অতগুলো ছেলে গেলে নজরে পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া বীরেনবাবুর বাড়ির ওপর পুলিশের তরফ থেকে ওয়াচ্ রাখা হয়েছে কিনা কে বলতে পারে ? তালতলায় বীরেনবাবুর এক বন্ধুর হোটেল আছে। শিবুরা সেখানে গেলে বন্ধু যত্ন করে যথেষ্ট খাইয়েছে। ছাদের ওপর টিনের একটা বড় চালাঘর আছে, সেখানে বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করেছে। বীরেনবাবু এসে সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করার কথা।

সাড়ে তিনটে নাগাদ বীরেনবাবু এলো কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

—কি রে তোরা খেয়েছিস তো ?

ঘোত্না বলে—হ্যাঁ। পেট ভরে খেয়েছি। কতদিন পরে ভালো খেলাম।

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ এটা ওটা বলে তারপরে চুপ করে থেকে শেষে বলে

—সুখেনটা মারা গেল একটু আগে। বাঁচার জন্যে খুব লড়েছিল। পারলো না।

খবরটা শুনে ওরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কেউ কারও দিকে চাইতে পারে না। শিবু ভাবে, তার জন্যে সুখেন মরল। মানিক ভাবে তার জন্যেই সুখেন এভাবে চলে গেল। যে বদনাম তার ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল সেটা ঘোচাতে সে একা বদলা নিতে গিয়ে জন্মের মতো চলে গেল।

ওরা অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলতে পারে না! স্বতঃস্ফূর্ত শোকের নীরবতা পালন করে তারা। বীরেনবাবুও ওদের দেখাদেখি চুপ করে থাকে। শিবু ভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাদের দুজ'ন সেরা সঙ্গী কমে গেল। অনেক কমজোর হয়ে গেল তারা। এবারে পুলিশ তাদের ছেড়ে কথা বলবে না। মানিকের বয়সটা একটু অল্প বলে তার চোখে সামান্য একটু জল এলো সবার অলক্ষ্যে।

ঘোত্না বলে—সুখেন আমাদের ফকির করে দিয়ে গেল রে। আমাদের ফ্যাক্টরী বোধহয় বন্ধই হয়ে যাবে।

নিউটন বলে—শহীদ বেদী বানাবো রাস্তার ওপর। সুখেন বাহাদুর ছেলে। একা গিয়ে দেঁতোকে সাবাড় করে দিয়ে এলো। শুনছি আর একটাও জখম হয়েছে খুব। সত্যি নাকি বীরেনদা?

হ্যাঁ। সেটাও মরেছে। সুখেনের আগেই মরেছে।

হারু বলে—আমরা তো সব সময় পাড়ায় ঢুকতে পারব না। আপনি শহীদ বেদীর ব্যবস্থা করে দিন।

—ঠিক আছে। আমি কালই পাথরের ওপর নামটাম লেখার জন্যে অর্ডার দিয়ে আসব, কিন্তু ওর পুরো নামটা দরকার।

নিউটন বলে—ও তো সুখেন মুখোটি, সত্যি কিনা জানি না। মুখোটি পদবী আছে নাকি?

বীরেনবাবু বলে—আছে মানে? খুব আছে।

শিবু বলে—আপনি শেতলদাকে বললে সে সব জেনে আপনাকে বলে

দেবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শীতলবাবু সব ব্যবস্থা করতে পারবে। তাই বলব।

ওরা নিজেদের মধ্যে সুখেনের অনেক কথা বলাবলি করে। বীরেনবাবু চলে যাবার জন্যে মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করে। তবু মুখখানাতে দুঃখ ভরিয়ে রেখে ওদের কথা শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে মওকা বুঝে সুন্দর সুন্দর সব কথা ছাড়তে থাকে।

বীরেন বটব্যালের সহানুভূতিতে শিবুর মন একটুও গলে না। নেংড়া শেতল ওর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। তবে আজ বীরেনবাবুকে এখন খুব দরকার। সুখেনের মৃত্যুতেও শিবুর মন গলে নি। ধাক্কা খেয়েছে প্রচণ্ড। সুখেন বিশ্বস্ত ছিল, তার ওপর বোমা তৈরিতে এক নম্বর। সুখেনের মৃত্যুতে দুঃখের চেয়েও নিজের ওপর রাগ হয়েছে তার বেশী। কারণ তার নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্যেই এটা হলো। নেতা হতে হলে খোঁটা দেবার কুঅভ্যাস ছাড়তে হয়। তার কাছ থেকে আস্কারা পেয়েছিল বলেই মানিক অমন কথা বলে ফেলেছিল। ন্যাটা হাবু অনেক উঁচুদরের নেতা ছিল। দলের সবাই ভাবত তারা প্রত্যেকেই অপরিহার্য। প্রত্যেকে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল।

সে বীরেনবাবুকে বলে—শুধু সুখেনের শহীদ বেদী করলে তো হবে না, ন্যাটা-হাবুরও করতে হবে। সে-ই তো আমাদের লীডার।

বীরেনবাবু আমতা আমতা করে বলে—বেশ তো, বেশ তো। একটা ফলকেই দুটো নাম থাকবে।

শিবু জোর দিয়ে বলে—না। দুটো বানাতে হবে।

—অনেক খরচা পড়ে যাবে রে। যা পাথরের দাম।

—আপনার অসুবিধা হলে আমরা চাঁদা তুলে দেবো। সবাই চাঁদা দেবে।

—না না, সেকথা বলছি না। আমিই দেবো। ঠিক আছে। এই কথাই রইল। কিন্তু এবারে তোরা কোথায় যাবি?

শিবু বলে—দেখি।

ওদের অসুবিধা, আর কিছু না। ন্যা টা হাবুর খুনের পর পয়সার টানা-টানি চলছে। রাতের খাবার যোগাড় করার মতো পয়সাও নেই। বীরেনবাবু একবার দিয়েছে এই যথেষ্ট।

বীরেনবাবু চলে যেতেই শিবু বলে—কিরে ঘোত্না, কদিন আবার লাইনে না নামলে উপায় নেই।

—হুঁ। সেই কথাই বলব বলব ভাবছিলাম।

—মানিকটা বয়সে কাঁচা। ও বরং চলে যাক্।

মানিক চমকে উঠে বলে—কোথায় যাব ?

—কেন ? বাসায়।

—আর পুলিশ ধরুক আমাকে।

—এখনানা। রাত হলে যাবি। আমাদের খবরটাও দিতে পারবি। করালী পিসির ঘরে থাকিস, অসুবিধা হলে।

—খাব কোথায়?

হারু খেঁকিয়ে ওঠে—আমরা খাব কোথায় ?

—তোমরা তো লাইনে নামছ। জুটবে কিছু।

—বাসায় গেলে তোর জুটবে না বলতে চাস ?

শিবু ধীর কণ্ঠে বলে—তোকে যেতেই হবে। ওখানকার সব খবর নিবি। পারলে শেতলদার সঙ্গে দেখা করবি। কাল গোবরা-গোরস্তানের সামনে আম ব দেখতে পাবি।

—কখন

—এই ধর সকাল নটা-দশটা নাগাদ।

—মানিক বলে—ঠিক আছে।

শিবু বলে—আমাদের সেই রাস্তা দিয়ে বস্তিতে ঢুকবি। লুকোবার অনেক মাচা আছে। সুখেনের ডেড-বডির কি হলো বুঝতে পারছি না। খুব সাবধান কিন্তু। পুলিশ নিশ্চয় জেনে গিয়েছে হাসপাতালের ডেডবডি কার। ধরা পড়লে তোকে আস্ত রাখবে না।

সন্ধ্যা হতেই ওরা বের হয়ে পড়ে। মানিক গুটি গুটি বস্তির দিকে চলে। সে ঠিক করে ফেলে হারুদাদের ঘরে গিয়ে শর্মিলার সঙ্গে একবার দেখা করবেই। হারুদার খবর জানিয়ে দেবে।

এদিকে শিবুরা হাঁটতে হাঁটতে এণ্টালী মার্কেটের পাশে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেয়ে নেয়। সামনের সিনেমা হাউসে বেশ ভীড় হয়েছে। একটা নতুন বই এসেছে।

শিবু আর ঘোত্‌নার কাছে দুটো পিস্তল রয়েছে। ঘোত্‌নার পিস্তলটা দিশী। নিউটন তাদের পেটো আর পাইপগান, লুকোনো জায়গা থেকে আনে নি। তবে হাকুর কাছে ছোট্ট ভোজালী আছে।

একটা ফাঁকা ট্যাক্‌সি মন্থর গতিতে রাস্তা দিয়ে আসছিল। শিবু হাত তুলে ট্যাক্‌সিটা থামায়। ড্রাইভার প্রশ্ন করে—কোথায় যাবেন?

—গড়িয়াহাট।

শিবুর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, সে কী করে যেন বুঝতে পারে ট্যাক্‌সি-চালক কোন্ দিকে যেতে ইচ্ছুক। ও যদি বলত, কাশীপুরে যাব, তবুও ট্যাক্‌সি চালক আপত্তি করত না।

—উঠুন।

শিবুর ডাকে ওরাও উঠে পড়ে। চালক একটু থতমত খায়। একসঙ্গে একবয়সী এতগুলো ছেলে দেখলে সব ড্রাইভারই আজকাল বিচলিত হয়। তার ওপর জামা প্যাণ্টের ছিরি-ছাঁদ নেই।

ট্যাক্‌সি-চালক মল্লিকবাজারের কাছে এসে বাঁয়ে পার্ক স্ট্রীটের দিকে বাঁক নিতে গেলে শিবু আপত্তি জানিয়ে বলে—বালিগঞ্জ সারকুলার রোড ধরে চলুন।

—সেটা একটু ঘোরা হয়ে যাবে না?

—ওখানে এক বাড়িতে একটু দেখা করব।

এতক্ষণে ড্রাইভার সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু তার আগেই ঘোত্‌নার পিস্তলের নল তার পিঠে ঠেকে যায়।

—চেঁচালে সুবিধে হবে না। ঘোত্‌না প্রায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে। ওরা ড্রাইভারের কাছ থেকে মাত্র একশো চার টাকা পায়। আর একটা ঘড়ি। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে কিছুটা গিয়ে এক মহিলার হার ছিনিয়ে নেয়। সুযোগটা ওরা আশা করে নি। কারণ এ রাস্তায় অবিরাম গাড়ি চলে। সেই সময়টা কেন যেন কোনো গাড়ি ছিল না। মহিলাও সম্ভবতঃ মাদ্রাজী। একা একা রাস্তা পার হচ্ছিল অন্ধকারে। অতবড় হার আসল না নকল পরে দেখতে হবে।

ড্রাইভার দরদর করে শুধু ঘামছে আর ঘামছে। কোন্ সময় স্টীয়ারিং এদিক ওদিক করে ফেলবে। জনবহুল জায়গায় ইচ্ছা করেও ফুটপাথের ওপর উঠিয়ে দিতে পারে। রিচি রোডের মোড়ে ঘোত্‌না গাড়ি থামাতে বলে।

গাড়ি থামলে শিবু বলে—পাশে ভদ্রভাবে বসে থাকবে, না পেছনে ক্যারিয়ারের ভেতরে ঢুকবে।

ড্রাইভারের বোধশক্তি বোধহয় অন্তর্হিত হয়েছিল। সে বলে—যা বলেন। তাকে পেছনের সিটে নিয়ে যাওয়া হয়। হারু মোটামুটি গাড়ি চালায়। ওর লাইসেন্স আছে। তবে অভ্যাস কম। দরকার বুঝলে একটু আধটু ওকে চালাতে হয়। সুখেন এক্সপার্ট ছিল।

শিবু পেছনের সিটে ড্রাইভারকে বসিয়ে তার দুহাত পেছনদিকে রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলে। হারু স্টীয়ারিং-এ বসে গাড়িটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বিড়লা মন্দিরের কাছাকাছি আসে। ততক্ষণে ড্রাইভারের মুখ বেঁধে তাকে পায়ের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওরা ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে একটা বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে। বাস আসতেই চারজনে ট্যাক্সির দরজা খুলে বাসে উঠে পড়ে। দুই স্টপ যেতেই বাস থেকে নেমে পড়ে কপার হাউসের পাশের একটা গলি দিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে।

ওদিকে মানিক অন্ধকারের মধ্যে ধাপার ক্ষেতের ভেতর দিয়ে বস্তির দিকে এগোতে থাকে। তার সারা গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র পোকা এসে লাগে। চোখের মধ্যেও দুএকটা ঢুকতে চায়। এগুলো চোখে গেলে দারুণ জ্বালা করে। মানিকের মনে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। সে যেন একঘরে। দলের সঙ্গে থাকার অধিকারও তার নেই। এতই তাকে ছেলে-মানুষ ভাবে ওরা।

বস্তির কাছাকাছি যেতে দুএকটা কুকুর ডেকে ওঠে। সে ঠিক করে প্রথমে নেংড়া শেতলের ঘরে যাবে। দরজার দিকে না গিয়ে পেছনের জানলার দিক দিয়ে দেখে নিয়ে তারপর ভেতরে ঢুকবে। কোথায় পুলিশ ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে ঠিক কি? হয়ত কাউকে না পেয়ে শেতলকেই পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছে।

এ্যাঃ, একটা পচা ড্রেনের মধ্যে পা পড়ে গেল। ড্রেনটির অস্তিত্ব তার অজানা নয়। অন্যমনস্কতার জন্যে এমন হলো। ওই ড্রেনে মনুষ্যদেহের যা কিছু বর্জনীয় পদার্থ সবই মিলবে। পাশের একটা মাচা থেকে অন্ধকারের মধ্যে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিল। পাতা হাতে নিয়ে মনে হচ্ছে মিট্‌-কুমড়োর মাচা। বড়বড় আর খস্‌খসে। তাই দিয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নেয় পা। কিন্তু গন্ধ যায় না।

একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে চলে সে এবারে। নেংড়া শেতল ওরফে শীতল চৌধুরীর পেছনের খোলা জানলা দিয়ে মিট্‌মিটে আলো বাইরে ঠিকরে পড়ছে। অর্থাৎ শেতল ঘরেই রয়েছে। বস্তির অনেকের ঘরে বিজ্‌লি বাতি আছে। শেতলেরও আছে।

মানিক জানলার কাছে গিয়ে আস্তে করে পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে গলা উঁচিয়ে ভেতরে উঁকি মারে। ভেতরের দৃশ্য দেখে সে কী করবে ভেবে পায় না। শেতল তক্তাপোষের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে আর চন্দ্রমিস্ত্রির বউটা তার কোলের ওপর উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শেতল তার মুখে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে

দিতে কী যেন বিড়বিড় করে বলছে। দূর থেকে তার চোখও খুব একটা শুকনো বলে মনে হলো না।

এখন কি করবে? চন্দ্রমিস্ত্রি কি বউকে মেরেছে? লোকটা এমনিতে মিনমিনে। মুখে দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্য বলতে কিছু নেই। অনেকে বলে চন্দ্র হিজড়ে। এদিকে বউকে শাসন করতে ওস্তাদ বলে মনে হচ্ছে।

মানিক জানলা থেকে সরে আসে। ওরা দেখে ফেললে লজ্জা পাবে। শেতলের সঙ্গে চন্দ্রর বউ-এর এককালে লটঘট ছিল কানাঘুষোয় শুনেছে সে। চন্দ্রমিস্ত্রি অত্যাচার করে সেটা উস্কে দিয়েছে।

আর যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে, পুলিশ নেই আশেপাশে। শেতল বাড়িতে আছে। কিন্তু তার ঘরে ঢুকবে কি করে এখন! কিছু খেতেও তো হবে। নিজের ঘরে যাওয়া কি এখন চলবে? যদি ধরা পড়ে যায়?

শেষে মরিয়া হয়ে সামনের দিকে এসে শেতলের দরজায় সন্তর্পণে টোকা দেয় কয়েকটা। ভেতরে একটা শব্দ হয়। বুঝতে পারে চন্দ্রমিস্ত্রির বউ আর শেতল দুজনাই আতঙ্কিত। পুলিশ এলেও বিপদ, বস্তির কেউ হলেও বিপদ। মানিকও বুঝতে পারে ওদের দুজনকে এখানকার লোকেরা এই সময় একসঙ্গে দেখলে ব্যাপারটা পূজো পূজো লাগবে না। বরং একটু আগের ড্রেনের পচা জিনিষের মতো লোকে নাক কুঁচকোবে।

মানিক একটু সময় নিয়ে আর একবার টোকা দেয়।

ভেতর থেকে শেতলের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়—কে?

—আমি। মানিক।

—ও মানিক? দাঁড়া—

শেতল দরজা আধ-খোলা অবস্থায় রেখে সামনে দাঁড়িয়ে বলে—তুই এ সময়ে? কোথা থেকে? ওরা কোথায়?

—ভেতরে যাব?

শেতল প্রথমে বাধা দিয়ে বলে—ভেতরে? আসবি?

—হ্যাঁ।

—তা আয়।

হাট করে দরজা খুলে দেয় শেতল। চন্দ্রমিস্ত্রির বউ ছুটে দরজার আড়ালে যাবার চেষ্টা করছিল।

শেতল বাধা দিয়ে বলে—চন্দনা, এ মানিক। মিস্ত্রি নয়।

দরজা বন্ধ হলে মানিক চন্দনার দিকে চায়। চোখের জল সে মুছে ফেললেও, অশ্রুজলে যে চূর্ণ-কুন্তল সিক্ত ছিল ঘরের আলোয় তা ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুর মতো চিক্‌চিক্ করছিল। তার মুখ লাল লাল। গম্ভীর।

মানিক বলে—মিস্ত্রি মারধোর করেছে নাকি?

শেতল হেসে বলে—অনেকটা সেইরকমই। বোস্।

চন্দনা ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে চলে যায়। জালাল শেখের বিবি জুলেখা অনেকক্ষণ ধরে চটের পর্দার দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল আর দাঁত কিড়মিড় করছিল। সে চন্দনাকে আজও অভিসারে যেতে দেখেছিল। এখন সেই চটের ওপর চন্দনার ফিরতি ছায়া দ্রুত চলে যেতে দেখে তার সর্বাঙ্গ গরম হয়ে ওঠে। মুখে ফিস্‌ফিস্ করে আপন মনে বলে ওঠে—ছি ছি।

মানিক বলে—সুখেন তো চলে গেল।

—হ্যাঁ, তোদের কে বলল?

—বীরেনবাবু।

—ও।

—পুলিশ এসেছিল?

—হ্যাঁ। তোদের দেখলেই ধরবে। খুনের ব্যাপার। ডি. ডি. কেস নিয়েছে।

—ডি. ডি. আবার কি?

—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট। সাবধানে থাকিস। থানার চেয়েও কড়া। থানা আমাকে সামান্য একটু খোঁড়া করে ছেড়ে দিয়েছে।

—আর ডি ডি হলে?

—ডি. ডি. তো থানা নয়। তারা ভারী ভারী কেস নেয়। মুখ থেকে তাদের কথা আদায়ের অনেক সব কায়দা আছে বলে শুনেছি।

—সত্যি ? কায়দা ?

—খারাপ লোকে তো তাই বলে। সুখেন একটা কিছু যে করবে আমি জানতাম।

মানিক হঠাৎ কেঁদে ফেলে বলে—আমার জন্য। হাবুদাকে মেরে যাবার সময় দেঁতোকে সুখেন পেটো ছুঁড়েছিল। সেটা ফাটেনি। আমি ক্ষেপিয়ে ছিলাম।

—তোদের তো বলেছিলাম, এ সব বলতে নেই। পেটোর কথা ছেড়ে দে। কত বিদেশী পিস্তল রিভলভারও অনেক সময় কাজ করে না। ভুল করেছিলি। যাহোক নিজেকে এবার থেকে শুধরে নে। যে গেল সে তো চলেই গেল। আর ফিরবে না। তবে মস্ত উপকার করে গেল।

মানিক কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরে থেকে বলে—পুলিশ কি বলল ?

—তন্ন তন্ন করে সব ঘর খুঁজলো। সুখেনের মাকে সরিয়ে ফেলেছিলাম অন্য ঘরে। সেখানে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওরা আশেপাশে নিশ্চয় আছে। দেখবি হয়ত আমার ঘরের পাশেই কান খাড়া করে বসে রয়েছে। কিংবা অন্য কারও ঘরের পাশে।

মানিকের গা ছম্‌ছম্ করে। বলে—আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

একটু আগে চন্দনা সাতখানা রুটি আর কুমড়োর তরকারি রেখে গিয়েছে। দরকার ছিল না। কারণ রাতে অতসব খায় না শেতল। তবু দুটো রুটি আর সামান্য তরকারি নিজের জন্যে রেখে দিয়ে বাকী সব মানিকের হাতে তুলে দেয়।

—তুমি ওইটুকু খাবে শেতলদা ?

—খা তো। আমার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।

মানিক গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল ঢক্‌ঢক্ করে গিলে নিশ্চিন্ত হয়।

—এবার কি করবি ?

—শিবুদারা আমাকে কাল সকাল নটায় গোবরা গোরস্তানের সামনে দেখা করতে বলেছে। এখানকার খবর জানবে আমার কাছ থেকে।

—বলিস সব ঠিক আছে। তোরা এখানে এলেই ধরবে। মাঝে মধ্যে একজন দুজন করে লুকিয়ে চুরিয়ে ঘুরে যেতে পারিস।

—চলবে কি করে ? ধর, হাবুদার সংসার—

—কি বলব বল্।

—ওরা কিন্তু আজেবাজে কাজ করবে। সেই সব কাজ। আজও করবে মনে হয়।

শেতল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে—করে করুক। খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো। তোদের ফুটপাথের চায়ের স্টল, যে সব পান-বিড়ির দোকানে মাল বিক্রি হয়, কোরোসিনের দোকান—এ সবের সঙ্গে বন্দোবস্ত নেই ?

—আছে। কিন্তু থানা থেকেও আসে সে সব জায়গায়। দেখা হয়ে গেলে ?

শেতল চুপ করে থাকে।

মানিক এ পর্যন্ত ছিনতাই-টিনতাই করে নি। বয়সে একটু ছোট বলে বোধহয় তাকে বাদ রাখা হয়।

সে বলে—হাবুদার মতো দেঁতো কাশীর লাশ নিয়ে মিছিল বার করবে না ওরা ?

শেতল বলে—করবে না আবার। বড় মিছিল বার করবে। এ তো জানা কথা।

—আজ বের হয় নি ?

—না। আজ ছুটির দিন। এ দিনে মড়া-কাটা ডাক্তার সব সময় পাওয়া যায় না।

—এত সব খবর রাখো ?

শেতল একটু বিরক্ত বোধ করে। মানিকের কাছেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রমাণিত আর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ?

—কোথায় শুবি রে মানিক ?

—দেখি—

মানিক বের হয়ে যায়। নিজের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পাঁচ বছরের ভাই নণ্টু চেঁচিয়ে ওঠে—মা, দাদা এসেছে।

মানিক ছুটে গিয়ে নণ্টুর মুখ চেপে ধরে। মা তক্তাপোষের নীচে ঢুকে কী যেন করছিল। বেরোতে পারে না তাড়াতাড়ি। সেখান থেকে খালি বলে—যাঃ। বাজে কথা। চুপ কর।

নণ্টু দাদার হাত দুহাত দিয়ে ধরে মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলতে চায় সত্যিই দাদা এসেছে। কিন্তু বলতে পারে না। মুখ লাল হয়ে ওঠে। দম আটকে যাবার মতো হয়।

মানিক ফিসফিস করে বলে—আমি এসেছি মা।

মা ছিট্‌কে তক্তাপোষের নীচ থেকে বের হয়ে আসে।

নণ্টু দাদার দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। মানিক তাকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দিতে যাবার আগেই মা ভীত স্বরে বলে ওঠে—এখুনি চলে যা। একটু আগে পুলিশ এসে দেখে গেল।

ক্রন্দনরত ভাইকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। হারুদের ঘরে গিয়ে শর্মিলাকে একটু চোখের দেখা দেখে যাওয়াও এ যাত্রা হলো না। সে আবার ফিরে যায় পেছনের সেই রাস্তা দিয়ে। এ-বারে আর ড্রেনে পা পড়ে না।

বড়বাবুর ফোন বেজে ওঠে। ডায়াল লাইনে সাধারণত বাইরের লোকেরা ফোন করে। ডি. সি. এ. সি-রা পি. বি. এক্স-এর মাধ্যমে সেই যোগাযোগ করে থাকে। যদি কখনো পি-বি. এক্স্ খারাপ হয় কিংবা এনগেজ্‌ড্ থাকে তখন ডায়াল ব্যবহার করা হয়।

বড়বাবু ফোন তুলে বলে—হ্যালো।

—আমি ব্যানার্জি বলছি। এ. সি।

—বলুন স্যার। থানায় আসবেন নাকি?

—না না। শুনুন। কথাটা জরুরী আর গোপনীয় বলে ডাইরেক্ট লাইনে করছি।

—বলুন।

—আমার কাছে এই মুহূর্তে একজন বসে আছেন। এখন নাম বলব না। বড় লীডার। সবাই চেনে।

—নামটা বলেই ফেলুন স্যার। বড় লীডার যখন।

—সেই জন্যেই বলব না। যা হোক যে কথা বলছি। আজ কাশীবাবুর শবযাত্রা কতবড় হয়েছিল দেখেছিলেন তো?

—কাশীবাবু? কোন্—? ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, বেশ বড় হয়েছিল।

—হাবুর চেয়ে বড় না?

—হাবুরটাতে শুধু বস্তির লোক গিয়েছিল। আর দেঁতো মানে কাশীবাবুর মিছিলে অনেক জায়গা থেকে লোক যোগাড় করা হয়েছে।

—হুঁ হুঁ। কে অরগ্যানাইজ করেছেন জানেন? আমার সামনে যিনি বসে আছেন।

—বেশ তো। আনন্দের কথা স্যার।

—কাজের কথা বলি শুনুন। আপনি গভর্ণর্‌স্ মেডেলের জন্যে একটা সাইটেশান পাঠান না কেন? আমি ডি. সি. কে বলব। আর যিনি বসে রয়েছেন তিনি বাকীটুকু করে দেবেন। কিছু ভাববেন না।

—আপনি মেডেল পেয়েছেন স্যার!

—না, আমি—

—তাহলে স্যার আপনিই বরং ওটা করুন। আপনি মেডেল পেলে খুব আনন্দ হবে আমাদের।

—যাক্‌গে। ওসব পরে ভাবা যাবে। আচ্ছা, শেতলদের বস্তির পিকেটের স্ট্রেন্‌থ্ এখন কত?

—তিন রাইফেল, দুই লাঠি, দুই গ্যাস।

—বাবা, এ যে বৃহৎ কাণ্ড করে রেখেছেন দেখছি।

—কেন স্যার। আপনি হেভী ফ্লাইং স্কোয়াড স্টেশানারী রাখতে বলেছিলেন।

—সে তো প্রথম দু-একদিন। যাকগে ওয়্যারলেশ থাকে?

—মাঝে মাঝে চেক্ করে।

—করেছেন কি মশায়। মিস্ইউজ অব্ ফোর্স দেখছি।

—ও. সি. বড় সাহেবের কথায় অবাক হয়ে যায়। এরকম উল্টো কথা কেন বলছে এ সি.? সে বলে—দেঁতো কাশীদের বস্তিতে অনেক বেশী ফোর্স আছে।

—আপনার অন্যের দিকে বড় নজর। কাশীবাবুর সঙ্গে এদের তুলনা করবেন না।

—বেশ তো, আর তুলনা করব না।

—আচ্ছা, থানা থেকে অফিসার যায় পিকেটের ইন-চার্জ হিসাবে, তাই না?

—দিনের বেলায় আর্মড্ পুলিশের অফিসারই থাকে। রাতের জন্যে আমাদের ডিভিসান থেকে এক এক থানা থেকে এক এক অফিসার যায়। ডি. সি. হেডকোয়াটারর্সের এ্যারেঞ্জমেন্টে সব আছে। আপনার কাছে কপি আছে।

—সে সব পরে দেখব। সাব-ইন্সপেক্টর যায় তো?

—হ্যাঁ। তবে সেটা সম্ভব হয় না সব সময়। এ এস. আইকেও পাঠাতে হয় বাধ্য হয়ে কোনো কোনো দিন।

—আজ রাতে কোন্ থানার অফিসার যাবে?

ও সি. কিছুতেই এ সি-র মতলব আন্দাজ করে উঠতে পারে না। পাশে সরকারী এম এল. এ কিংবা ওই ধরনের কোনো হাফ্-ভি আই. পিকে বসিয়ে রেখেছে দেখা যাচ্ছে। সে বলে—একটু দেখে বলছি।

একটু পরে ও প্রান্ত থেকে ধৈর্যহারা কণ্ঠ—কী মশায়। এত দেরি লাগে দেখতে? এ কি সিপাইর বিট-ডিউটি যে হালদার ডাকতে হবে?

ও. সি. বলে—পেয়েছি। সাব-ইনস্‌পেক্টর বর্মন যাবে আজ।

—বর্মন? মানে অপনার থানার?

—হ্যাঁ।

—খেয়েছে। ও তো ট্যাক্‌ট্‌লেশ। মাথা গরম। কিছু দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশান্‌ নিয়ে বসবে।

—বর্মনকে আপনি বলছেন ট্যাক্‌ট্‌লেশ? ওর মতো—

—থাক থাক। ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেখছি। ওকে পাল্‌টে দেওয়া যায় না আজকের মতো?

এতক্ষণে ও. সি. সতর্ক হয়ে ওঠে। নরম স্বরে বলে—আমার অন্য অফিসার নেই স্যার।

—কেন? এ. এস. আই। হেডকনস্টেবল? আপনার সেই দারোগাপ্রসাদ কোথায়?

—কেউ নেই স্যার। অন্য থানা থেকে বরং ব্যবস্থা করুন। আমি সেই অনুযায়ী জি-ডি করে রাখি।

এ. সি. চিৎকার করে ওঠে—ধুৎ মশাই। কথায় কথায় জি-ডি, জি-ডি। কে আপনাকে জি-ডি করতে বলছে। আসল ঘটনাটা শুনুন।

ও. সি. মনে মনে বলে, পথে এসো। মুখে বলে—বলুন স্যার।

—আজ কাশীবাবুর দলের লোকেরা হ্যাটা-হাবুর বস্তিতে একবার যাবে। কাশীবাবুর হত্যাকারীদের খুঁজবে।

ও. সি চমকে ওঠে। পরে বলে—আপনার কাশীবাবুর হত্যাকারীদের কেউ ওখানে নেই। আমার লোক আছে। ডি. ডি. নজর রাখছে। এস. বি-ও আছে।

এ সি. অধৈর্য হয়ে বলে—শুনুন। তবু ওরা যাবে। বর্মনকে বলবেন, হুম্‌-দাম্‌ রাইফেল কিংবা গ্যাস না চালায়।

—ওরা বোমা ছুঁড়বে ?

—ছুঁড়তে পারে। একেবারে মাথা ঠিক নেই ওদের।

—তাহলে বর্মনের মাথাও ঠিক রাখা অসুবিধা হবে।

—আমি বলছি, বর্মনকে সাবধান করে দেবেন।

ও. সি. তাড়াতাড়ি বলে—করব স্যার।

—ঠিক তো ?

ও. সি. যেন কথাটা শুনতে পায় নি। এ. সি.র সঙ্গে কথোপকথনের সারাংশ জানাতেই ডি. সি. বলে ওঠে—বলছেন কি মশায়।

ডি. সি.কে একটু ভাববার সময় দিয়ে ও. সি. বলে—একটা ওয়্যারলেশ ভ্যান আজকের রাতের মতো ওখানে স্টেশানারী রাখতে পারলে ভালো হয় স্যার।

—আমি এখুনি ডি সি হেডকোয়াটার্সকে বলছি। আর গড্ ফরবিড তেমন যদি কিছু সত্যি ঘটে, তাহলে কি হবে বলতে পারছি না।

—ন্যাটা হাবুর দলের কেউ নেই ওখানে। লুকিয়ে এক আধজন হয়ত আসতে পারে কিছুক্ষণের জন্য। বস্তির লোকেদের ওপর আক্রমণ হলে বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে।

ডি. সি. বলে—হেভী থাকলে ভালো হতো। কিন্তু হেভী ফ্লাইং স্কোয়াডের এত চাহিদা, পাব বলে মনে হয় না। দুদিন আগে প্রেসিডেন্ট ঘুরে গেলেন, কাল আবার প্রাইম মিনিস্টার আসছেন। এত ঘন ঘন প্রেসিডেন্ট আর প্রাইম মিনিস্টার কখনো এসেছেন ? আপনারা তো অনেকদিন ফোর্সে আছেন।

—না স্যার। মনে পড়ে না। আমি দুটো বিট রাতের মতো তুলে দিয়ে বাড়তি কন্স্টেব্ল্ পাঠাচ্ছি।

—তাই পাঠান। আমি দেখি অন্য থানা থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু বর্মন একা সামলাতে পারবে তো ?

—বর্মন একা পারবে। তবে কন্ট্রোল থেকে একজন ইন্স্পেক্টার পেলে

খুব ভালো হতো। না পাওয়া গেলে আমি থাকব।

—সেই ভালো। কিন্তু কাল সকালে আপনার প্রাইম মিনিস্টারের লাইন-অব-রুটে ডিউটি আছে দেখলাম। আপনি থাকবেন কি করে ?

—তুটো আড়াইটে অবধি থাকতে পারব। তারপরে কিছু হলে বর্মনকে একা সামলাতে হবে।

রাতে একটা ওয়্যারলেশ ভ্যান পাওয়া গেল। ইন্‌স্‌পেক্টর পাওয়া গেল না। প্রাইম মিনিস্টারের ব্যাপারে সবদিকেই টানাটানি। সুতরাং ও.সি বর্মনকে সময় মতো পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এগারোটা নাগাদ প্রস্তুত হয়ে বেরোতে যাচ্ছিল, সেই সময় রিং হয়।

আবার সেই এ. সি.! ও প্রান্ত থেকে বলে—আপনি করছেন কি ? ডি সি.-কে বলতে গেলেন ?

—কি করব স্যার। এতবড় ব্যাপার হবে। তাই জানিয়ে রাখলাম।

—ও। বেশ। নিজেই নিজের কবর খুঁড়লেন।

—কবর খুঁড়বো কেন স্যার ?

—অমন ক্যাবলার মতো কথা বলবেন না। কিন্তু এখন আমি ওদের বলি কি করে ? ওরা যে কিছুই জানবে না।

ও সি. ফোন ছেড়ে নীচে ছোটে। এ সি-র জন্য কষ্ট হয়। তাই অপমানের জ্বালা অতটা অনুভব করে না। লোকটা তুর্বল মনের। এই তুর্বলতা মানুষকে কতটা অন্যায় পথে নিয়ে যায় ভাবা যায় না। সেই সঙ্গে পদমর্যাদা বৃদ্ধির মোহ আর সর্বোপরি অর্থের মোহ। অর্থের মোহ কয়জনেরই বা নেই। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। তাই বলে সবটুকু নীতি বিসর্জন দিতে হলে একেবারে মেরুদণ্ডহীন কিংবা শয়তান হতে হয়!

স্পটে গিয়ে ও সি. পিকেট ভালোভাবে পোস্টিং করে দেয়। ওয়্যারলেস ভ্যানকে ইন্‌সট্রাক্‌সান দেয়। ওয়্যারলেস এবং নিজের গাড়ির এ্যামপ্লি-ফায়ার পরীক্ষা করে নেয়। তুটোই কাজ করছে। যদি দেঁতো কাশীর লোকজন আক্রমণ করে তাহলে তাদের দূর থেকে সাবধান করে দিতে

হবে।

ওরা অপেক্ষা করে। সময় কাটে। শুক্লপক্ষ, না কৃষ্ণপক্ষ বোঝার উপায় নেই। আকাশে আপাতদৃষ্টিতে চাঁদ দেখা যায় না। হয়ত কোনো গাছের আবডালে কিংবা টুক্‌রো মেঘের আড়ালে অথবা উঠেই ডুবে গিয়েছে কিংবা দেরিতে উঠবে। কে খবর রাখে? পুলিশের তো রাখার উপায়ই নেই। কোটি কোটি মশার আক্রমণে হাত মুখ ফুলে উঠেছে এটাই মোদ্দা কথা। হাত বুলিয়ে দিলেই মশা মরে যায়। চটাস্ চটাস্ শব্দ করতে হয় না। তেমনি একদল মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে যায়। আবার হাত বোলাও। বুলিয়েই চলো।

আবর্জনার তীব্র গন্ধ নাকে এসে লাগে এক এক সময়। ট্যানারীর পচা চামড়ার গন্ধ তো আছেই।

ও সি. বলে—শুনেছি বিধান রায় নাকি বলতেন পচা চামড়ার গন্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। টি বি-র প্রতিষেধক।

বর্মন বলে—কথাটা কি সত্যি?

—কে জানে? গুল-তাপ্পিও হতে পারে।

বর্মন হাসে।

ওয়্যারলেস অফিসার এসে ও. সিকে বলে—স্যার রিপোর্ট চাইছে।

—বলে দিন, সো ফার এভরিথিং ইজ পীসফুল।

একসময় বর্মন টর্চ জ্বালিয়ে তার ঘড়ি দেখে নিয়ে বলে—আড়াইটে বেজে গিয়েছে। আপনি চলে যান স্যার। কাল সাতটায় তো আপনাকে আবার লাইন-অব-কটে দাঁড়াতে হবে।

আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে তিনটের সময় ও সি সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে জীপে উঠে চলে যায়।

আক্রমণটা শুরু হলো পৌনে চারটে নাগাদ। দিগন্তে উষার উদয় তখন হবো হবো। অন্ধকার কাটে নি। রাস্তার আলোয় কিছুটা আলোকিত, আবার কিছু অংশ অন্ধকারই থেকে গিয়েছে। বাল্‌ব্ ফিউজ অথবা

চুরি। সেই সময় চৌদ্দ পনেরো জনের দল এদিক ওদিক থেকে ছুটে আসে বেশ আনন্দ করতে করতে।

বর্মন তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ফোর্সকে প্রস্তুত করে নেয়। ওয়্যারলেস অফিসার তার লাউড-হেলার অন্ করে ক্রমাগত সাবধান করতে থাকে আক্রমণকারীদের—আপনারা এগোবেন না। সরে যান আপনারা। আপনারা এ্যাটাক্ করলে আমরা এ্যাকশান নেব।

দেঁতোর দলের লোকেরা ভাবে, এ সমস্ত পুলিশের শো। লোক দেখানো ব্যাপার। তারা আরও এগিয়ে এসে হৈ হৈ করে বস্তির ওপর বোমা ছুঁড়তে থাকে অবিরাম। যেভাবেই হোক জেনে গিয়েছে তারা হাবুর দল বস্তিতে নেই। আর জানে পুলিশ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। নইলে এত নগ্ন আক্রমণ তারা করতে পারত না। বোমাগুলো প্রচণ্ড শব্দে বস্তির চালের ওপর, উঠোনে, শশার মাচায় যত্রতত্র পড়তে থাকে। বর্মন প্রথমে গ্যাস চার্জ করে। কারণ এই অবস্থায় লাঠি নিয়ে এগোনো যায় না। ওরা একটু থমকে যায়। বিস্মিত হয়। তার পর হিংস্রভাবে পিকেট আর ওয়্যারলেস লক্ষ্য করে বোমা আর পাইপগান ছুঁড়তে থাকে। একজন লাঠি-কনস্টেবল জখম হয়ে বসে পড়ে। বর্মন এবারে দু-রাউণ্ড ফায়ারিং-এর অর্ডার দেয়।

একজন লোক রাস্তার ওপর পড়ে যায়। ওরা বারবার তার দিকে চেয়ে শেষে ছুটতে ছুটতে পেছু হটে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। যন্ত্রণায় লোকটা ছট্‌ফট্ করতে করতে নিশ্চল হয়ে যায়।

বর্মন ওয়্যারলেস মারফৎ সমস্ত ঘটনা লালবাজারে জানিয়ে দেয়। তার-পর একটু ঝুঁকি নিয়ে পড়ে যাওয়া লোকটাকে ওয়্যারলেস করে হাস-পাতালে পাঠিয়ে দেয়। লোকটা নিশ্চয় মরেছে। তবু শেষ কথা বলার অধিকার একমাত্র ডাক্তারের। হয়ত বেঁচে উঠতে পারে সময় মতো চিকিৎসা হলে। আহত সিপাইকেও তুলে দেওয়া হয়। ওয়্যারলেস অফিসার-কে বর্মন বলে দেয় আর একটা ভ্যান যেন এই মুহূর্তে ডাইভার্ট করে

দেয়। এ্যাম্বুলেস ডেকে আহত ব্যক্তিদের পাঠাবার সময় থাকে না। এ্যাম্বুলেস আসতে দেরি হয়।

ইতিমধ্যে পিলপিল্ করে বস্তির লোকেরা বেরিয়ে পড়ে। দু'একজন যন্ত্রণায় কাতরায়। সেই সময় বড় রাস্তার লাগোয়া একটা ঘর থেকে নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার সব কিছু কলরবকে ছাপিয়ে যায়।

—ওরে আমার নণ্টুরে—

বর্মন রীতিমত গম্ভীর। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু লোক চোট পেল। অনেকের ছাদ ভেঙেছে। তবে আগুন জ্বলতে দেখা যায় নি। বর্মন অস্থির ভাবে এদিক ওদিক পায়চারী করতে থাকে। এই সময় কণ্ট্রোলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকা অত্যন্ত জরুরী। একটা এ্যাম্বুলেস দরকার। কিছু লোকের চোট লেগেছে। অন্য ওয়্যারলেসটা এসে পড়লে ভালো হতো। ওই বুকফাটা চিৎকার করছে যে মহিলা তার নিশ্চয় বড় রকমের ক্ষতি হয়েছে।

সেই মুহূর্তে আর একটা রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড এসে উপস্থিত হয়। বর্মন অফিসারকে বলে—কয়েকজন বস্তিবাসী আহত হয়েছে। একটা এম্বলেন্স এখনি দরকার। সেই সঙ্গে একজন সুপিরিয়ার অফিসার এলে ভালো হতো। আমাদের ডি সি কে সব খবর জানিয়ে দেওয়া হয় যেন। ওয়্যারলেস অফিসার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই সময় নেংড়া শেতল একদল লোক নিয়ে এসে হাজির। সে বলে—বর্মনবাবু, আপনি ছিলেন বলে অল্পের ওপর দিয়ে গেল। নইলে বস্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে যেত ওরা।

—আপনাদের কতজন জখম হলো?

—চার পাঁচজন। সেটা কিছু না। কিন্তু একটা বাচ্চা মারা গেল।

—মারা গেল! বোমায়?

—হ্যাঁ।

বর্মন আরও গম্ভীর হয়ে যায়। এটা তার ব্যর্থতা। সে বলে—এ্যাম্বুলেন্স

আসছে সবাইকে পাঠিয়ে দিন। ছেলেটাকেও তুলে দেবেন।

—বাচ্চাটাকে নিয়ে লাভ নেই।

—তবু ডাক্তার দেখুক। সেটাই নিয়ম।

—বাঁ দিকের বুকে স্প্লিন্টার ঢুকে গেলে—পাঁচবছরের ছেলে কেন বুড়োরাও বাঁচে না।

ভোর হতে না হতে ডি. সি. এলো। ও. সি.ও চলে এলো। তার আগে সেই বাচ্চা ছেলেটির দেহ আর আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ডি. সি রীতিমত গম্ভীর। ও. সির মুখে হতাশার স্পষ্ট ছাপ। বর্মন নিজেকে একটু অপরাধী ভাবে। তার উপস্থিতিতে বাইরের থেকে ওরা এসে বস্তির ক্ষতি করল, একজনকে হত্যা করল এবং কিছু লোককে আহত করে গেল।

সে স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় ও. সিকে বলে—আপনার আর ডি. সি দুজনারই তো প্রাইম মিনিস্টারের ডিউটি ছিল।

—হ্যাঁ। ডি. সি একটু পরেই চলে যাবেন। আমি থাকব। আমার জায়গায় কণ্ট্রোলরুম থেকে কাউকে পাঠাবে ঠিক হয়েছে।

—ভালো হয়েছে।

—কণ্ট্রোল ডি. সি.কে সব বলেছে। তুমি বিস্তারিত ভাবেই জানিয়েছ। শেতল কোথায়?

—একটু আগে ছিল। বোধহয় ছেলেটার মায়ের কাছে। আসবে এখুনি। ডি সির আসার খবর চলে গিয়েছে এতক্ষণে। একটা পড়েছে স্যার।

—শুনলাম ডি সি.র কাছে। কে পড়ল?

—চিনতে পারলাম না। মুখের একটা দিক পোড়া।

ও সি. চেঁচিয়ে উঠে বলে—সাবাশ। তুমি তো কেল্লা ফতে করে দিয়েছ।

বিস্মিত বর্মন বলে—কেন স্যার?

—ও তো মুখপোড়া ভল্টু। দেঁতোর ডেপুটি। আমাদের থানাতেও ওর

একটা খুনের কেস ঝুলছে।

ডি. সি. সব শোনে। তারপর প্রশ্ন করে—এত ভাঙচুর করল কি করে? বর্মন বলে—ওরা স্যার দল বেঁধে ছুটে আসে। আমরা বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও ভ্রূক্ষেপ করল না। বোমা ফেলতে শুরু করল। তখন প্রথমে গ্যাস, পরে গুলি চালাই। ওরা আমাদের গ্রাহ্যই করছিল না।

—হুঁ।

সেই সময় শেতল এলো। বলল—স্যার, আমাদের ছেলেদের পাড়া-ছাড়া করে ওদের লেলিয়ে দিলেন? এটাকি ভালো হলো?

—ওকথা বলবেন না, ও. সি. নিজে রাত তিনটে অবধি ছিলেন। তাছাড়া ওদের মুখপোড়া ভল্টু গুলিতে মরেছে!

—মুখপোড়া? সে তো সাংঘাতিক।

—তবে? ওভাবে পুলিশের ওপর কথায় কথায় দোষারোপ করার চেষ্টা ছাড়ুন।

শেতল আপন মনে বলতে থাকে—মুখপোড়া মরেছে? যাক্—

পুলিশ মুখপোড়া ভন্টুকে গুলি করে মেরেছে। সুতরাং শীতল চৌধুরীর বস্তিতে কোনো রকম হৈচৈ শোনা গেল না। নণ্টুর মা কেবল কাতর কণ্ঠে কেঁদেই চলল। এখানকার অনেক মায়েরা পুত্রশোকে এভাবে হামেশা কেঁদে কেঁদে মাথা কোটে আর বাবাদের কণ্ঠমণি এমনভাবে আটকে যায় যে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

ডি. সি. চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল যে প্রাইম মিনিস্টারের ডিউটির পরে এগারোটা নাগাদ আবার আসবে।

ও. সি. তার স্পেশাল রামশরণকে আনতে পারেনি। আনতে চায়ও নি। তার ইচ্ছে রামশরণকে সরিয়ে দেবে। চালাক চতুর তেমন পাওয়া মুশকিল। আসলে নীতিজ্ঞান যার একটু কম থাকে আর পয়সার জন্যে যে বেশী ছুঁক্‌ছুঁক্ করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সে-ই ভালো কাজ দেখায়। কারণ চোখ খোলা রেখে কান সজাগ রেখে সব জায়গাতে এরা

খোঁচা দিয়ে দিয়ে দেখে কোথায় চপ্ চপ্ আওয়াজ উঠছে—গুপ্তধন কোথায় আছে। তবু রামশরণকে রাখা চলবে না। আর বেশী রাখলে হয়ত কোনো ডাকাত-পার্টির নেপথ্য-নায়ক হয়ে উঠবে।

একটু পরে রামশরণ নিজেই হাঁপাতে হাঁপাতে এলো এবং একগাল হেসে ও. সি.কে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—মানিককে পাকড়েছি হোজুর।

—কোন্ মানিক।

—এই বস্তির ন্যাটা-হাবুর মানিক। হাসপাতালে কান্‌তেছিল হাউ হাউ করে। ওর ভাই মরেছে বোমা খেয়ে!

—কবে?

—আজ রাতে। বাচ্চা লেড়কাঠো মরিয়েছে না? ও-ই তো মানিকের ভাই আছে।

ও. সি. গম্ভীর হয়ে বলে—ভালো করেছিস। তুই খবর পেলি কোথায়?

—কান্‌ট্রোল থেইকে থানায় ফোন গেলো,'হাসপাতালে অনেকে গিয়েছে। শুনে ছুটলাম হোজুর।

—মানিক কোথায়?

—থানা লকআপে। এখনো কান্‌তেছে। বদমাস আছে।

ডি. সি. আসে এগারোটার অনেক আগেই। কপালে রেখা ফুটে আছে তার। মনটা বিক্ষিপ্ত। কমিশনার সাহেব ফোনে ও. সি. সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছে। ডি. সি. বুঝতে পারে ওপর থেকে কলকাটি নেড়ে সি. পি.র মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে চাপের সৃষ্টি হয়েছে। কমিশনার সাহেব ও. সি.-কে বদলী করার ব্যাপারে ডি. সি.র অভিমত জানতে চেয়েছেন। ডি. সি. বলে এসেছে যে ও. সি. একজন অত্যন্ত কনসাস ও কৌশলী সৎ ও অনুগত অফিসার। এই ও.সি.র সঙ্গে তুলনা করার মতো অফিসার বেশী পাওয়া যাবে না। দিনগত পাপক্ষয় শুধু নয়, একটা বাড়তি উদ্দীপনা নিয়ে ও. সি. কাজ করে। তার জন্য গর্ব হওয়া উচিত। কমিশনার সাহেব একটু থেমে থেমে বলেছেন—বুঝেছি। আপনার সঙ্গে আমার যা

যা কথা হলো ভুলে যান। পরশু দিন যে ক্রাইম কনফারেন্স হবে। তার আগে ফার্স্ট আওয়ারে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। পি. এম. তো কালই চলে যাচ্ছেন।

—ভেরী ওয়েল স্যার।

তিনটে শহীদ বেদী না বলে বরং আড়াইটে বলাই ভালো। নণ্টু ছেলেমানুষ, তার প্রস্তরফলকও সেই অনুপাতে ছোট। তিনটেই বীরেনবাবু করে এনেছে। পাশাপাশি স্থাপন করা হলো। খরচা হয়ে গেল কিছু বীরেনবাবুর। তা হোক। কর্পোরেশনের ইলেকশান এগিয়ে আসছে। এখানে পাকা ড্রেন তৈরী, বস্তির ভেতরে কর্পোরেশনের খরচে লাইট, জলের প্রেসার আরও বাড়ানো, টিউবওয়েল ইত্যাদি করে দেবার আশ্বাস একথা সে কথার মধ্যে প্রায়ই বলে।

শহীদ বেদী প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে শীতলের আন্তরিক ভাষণের পরই শুরু হলো বীরেনবাবুর পেশাদারী বাগ্মিতা। রীতিমত জ্বালাময়ী ভাষণ। সেই সঙ্গে আবার বস্তির উন্নয়ন ইত্যাদির কথা। প্রতিজ্ঞা করল বীরেনবাবু, কাউন্সিলার হবার পর তার প্রথম কর্তব্য হবে শহীদবেদীর ওপর পাকা ছাদ তৈরী।

বস্তিবাসীদের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে এলো বীরেনবাবু। এই দুঃসময়ে সে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই তাকে বিশাস করে ফেলল। শেতল ভাবলো বীরেনবাবু কিছুই ছাই করতে পারবে না। তবু ভোট তাকে দিতে হবে শিবুদের স্বার্থ ভেবে। এর বিকল্প নেই।

শিবুরা সবকিছু দেখল চার পাঁচটা পাশাপাশি বস্তির ভীড়ের সঙ্গে মিশে। সেখানে পুলিশকে আসতে দেওয়া হয় নি, সাধারণ পোশাকে পুলিশও আসতে পারে নি। কদিন ধরে দেখে দেখে সবাই তাদের চিনে ফেলেছে। অথচ হঠাৎ তাদের বদলও করা যায় না। এখানকার মস্তানদের নতুন লোক এসে চিনতে পারবে না। ভীড়ের মধ্যে শিবুরা গিয়ে দাঁড়ালেও

পুলিশের লোকেরা দূর থেকে তাদের ঠিক চিনে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অফিসে খবর পৌঁছে দিলো।

এত সব কাণ্ড হলো, শুধু মানিক নেই। সে পুলিশ হাজতে। কীভাবে আছে, জানতে পারে না কেউ। বীরেনবাবুও সুবিধা করতে পারে নি। মানিক ওর ভাই-এর খুন হবার কথা জানতে পেরে ছুটে চলে গিয়েছিল হাসপাতালে। তখন তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তাই তাকে রামশরণ ধরে ফেলল।

বেদী প্রতিষ্ঠা হলো দশটা নাগাদ। তারপর পুরুষেরা যে যার কাজে বাইরে চলে গেল। চন্দ্রমিস্ত্রিও চলে গেল। চন্দনার সঙ্গে তার বেশী কথা-বার্তা নেই আজকাল। চন্দনার তাতে এসে যায় না। সে সেলাই-এর কাজ জানে। কখনো ক্রুশের কাজ কখনো সূচের কাজ। আজও তাই করছিল। উলের কাজও সে ভালো জানে। কিন্তু উল কেনার সামর্থ্য নেই বলে হয়ে ওঠে না। তার যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল শেতলকে একটা সুন্দর সোয়েটার তৈরী করে দেবার। সেই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। কোন্ ইচ্ছাই পূর্ণ হলো? বয়ঃসন্ধিকাল থেকে যার অঙ্কলক্ষ্মী হবে বলে স্বপ্ন দেখে এসেছিল, শেতলের এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ফলে যাকে সে মনের সুদূরতম কোণেও স্থান দেয় নি সেই চন্দ্রমিস্ত্রিকে বিয়ের সম্মতি জানালো অনেকটা জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে। তাই তার বিবেক বিদ্রোহ করে নি। অদ্ভুত একটা নিস্পৃহতা বরাবর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যখন সে স্বপ্ন দেখত তখন তার মনের চিন্তা-ভাবনার গতি কী দুরন্ত ছিল। দেহকে কত সজীব লাগতো। অথচ বিবাহের পরেই দেহের সব চঞ্চলতা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। ভাবলো, বিয়ের পরে বুঝি এমনিই হয়। একটা নিশ্চয়তা এসে যায়—পাওয়ার উদগ্র আগ্রহ আর থাকে না। ভাবতো, ভালোই হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে মেশার এই যখন পরিণতি আনন্দ বলে যখন কিছু নেই, তখন শেতলের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দিয়েও লাভ হতো না। কারণ

তার ভেতরে ভেতরে একটা কল্পনা ছিল, পুরুষের সঙ্গ আরও বহুগুণ আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু এখন ? হ্যাঁ, এখন শেতলের সঙ্গে মিশে, তার ঘরে গিয়ে চন্দনা এই বয়সেও প্রমাণ পেয়েছে কী নিদারুণ ভুল সে জীবনে করে ফেলেছে। জালালের বিবি জুলেখা সেদিন তাকে দেখে ফেলেছিল। অনেক রাত—জুলেখা কেন যে দরজার গোড়ায় চটের পর্দার আড়ালে ওভাবে ওৎ পেতে বসে ছিল কে জানে ?

কাটাকাটা ভাবে জুলেখা বলেছিল—কেলেঙ্কারী কিছু হয়ে গেলে সামলাতে পারবে তো মিস্তিরির বউ ?

জুলেখার নাকমুখ যে ফুলেফুলে উঠছিল, সেই রাতের অন্ধকারেও বুঝতে পারছিল চন্দনা। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধরা পড়ে গিয়েছে। তবু আশ্চর্য, একটুও বুক কাঁপলো না তার। তার দেহমন তখন পরিপূর্ণ, শান্ত।

একটু মিষ্টি হেসে বলেছিল জুলেখাকে—শেখ সাহেব বুঝি ঘরে নেই ?

জুলেখা বলে—মেদিনীপুর গিয়েছে। নিজের গাঁয়ে। আমার কথাটা শুনতে পেয়েছ ?

—পেয়েছি ?

—তোমার ভয় নেই ?

—ভয় কিসের ?

—জান না ? পেটে যদি এসে যায় ?

—আসুক না।

জুলেখা চমকে ওঠে। বলে—তুমি—তুমি—এটা কি বেশ্যাপল্লী ?

—ছিঃ, তা হবে কেন ? যাকে চিরকাল চেয়েছি, এতদিনে তাকে পেয়েছি। বেশ্যারা কি তাই ?

জুলেখার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে এভাবে কখনো ভাবতে চায় নি, এভাবে ভাবতে গেলে কত কিছু মনে হয়। সেটা মনে হওয়া উচিত নয়। সে জালাল শেখের বিবি। ব্যস্। তার আর কোনো পরিচয় নেই। শুধু

কেউ যদি তাকে 'মা' বলে ডাকতো, তাহলে সব অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হয়ে যেত। অতীতের হাতছানিকে সে স্বীকার করতে চায় না।

জুলেখা বলে—তুমি সর্বনাশী।

—জুলেখাদি, পেটে তো কখনো কিছু ধরিনি। জানি না কেমন লাগে। লোভ হয়। কিন্তু তোমরা কি ছাড়বে? তাই, সত্যিই কিছু এসে গেলে গলায় দড়ি দেবো।

জুলেখা থ হয়ে বসে থাকে। তার মনে প্রবল আলোড়ন তুলে দিয়ে চন্দনা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

আজ শহীদ বেদী প্রতিষ্ঠার পর চন্দনা তার ঘরে বসে যখন সেলাই করছিল, শর্মিলা এসে ঢোকে। সে আজ আর দাদার শার্ট প্যান্ট পরে নি। তার সাবেকী ছেঁড়া ফ্রক পরে এসেছে। চন্দনা তাতে অনেক জোড়া তালি দিয়েছে।

চন্দনা একবার আড়চোখে শর্মিলাকে দেখে নিয়ে নিজের কাজ করতে যায়। শর্মিলা প্রায়ই আসে। এসে বলে তোমাকে দেখতে দিন দিনই সুন্দর হচ্ছে। এই বয়সে তাই হয় বুঝি?

আজ কিন্তু শর্মিলা কিছুই বললে না। চুপচাপ চন্দনার পাশে বসল। বসে অন্যদিনের মতো সেলাই না দেখে মাথা নীচু করে রইল।

চন্দনা বলে—শহীদ বেদী বেশ হয়েছে। তাই না রে?

শর্মিলা উত্তর দেয় না।

চন্দনা ভাবে, হয়ত ঘাড় কাৎ করে উত্তর দিয়েছে শর্মিলা। তাই বলে—কে কে সুন্দর বলল?

চন্দনার উদ্দেশ্য, শেতল কেমন বলল সেটা জেনে নেওয়া। তবু শর্মিলার সাড়া নেই।

সেলাই বন্ধ রেখে শর্মিলার দিকে চেয়ে চন্দনা দেখে সে মাথা নীচু করে রয়েছে। আর তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে

মেঝের ওপর।

—শর্মিলা তুই কাঁদছিস? কেন?

শর্মিলা ফুঁপিয়ে উঠে চন্দনার কোলের ওপর পড়ে। চন্দনা অবাক হয়। বুঝতে পারে না কি হলো। ওকি আজ খেতে পায় নি? কিন্তু তা তো নয়। শুনেছে শিবুরা সবাই বেশ কিছু টাকা এনে দিয়ে গিয়েছে।

—কি হয়েছে বল্। কেউ বকেছে?

—মানিকদাকে ওরা কবে ছাড়বে!

চন্দনা স্তম্ভিত। মেয়েটি যে এতো বড় হয়েছে তার মাথায় আসে নি। শেতল সম্বন্ধে কবে প্রথম সে সচেতন হয়েছিল? সেই যেবার শেতল একা দাঁড়িয়ে বস্তি রক্ষা করেছিল। সব্যসাচীর মতো দুহাতে ক্রমাগত বোমা ছুঁড়ে আটদশ-জন লোকের মোকাবিলা করেছিল হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়ে। তখন কতই বা বয়স শেতলের? চব্বিশ-পঁচিশ। আর চন্দনা তখন এই শর্মিলার মতোই কিশোরী ছিল।

শর্মিলা অনেক চোখের জল ফেলে একটু ধাতস্থ হয়। তখন চন্দনা বলে—মানিক কখন ছাড়া পাবে কেউ বলতে পারবে না। তার জন্যে অস্থির হলে চলবে না তোকে। তোর মতো নরম ধাতের মেয়ে হলে কি মানিক-দের চলে? তুই বরং তার চাইতে ওর কথা ভুলে যা। কত শান্তশিষ্ট ছেলে পাবি।

ঘাড় ঝাঁকিয়ে শর্মিলা বলে—না।

—তাহলে সহ্য কর। চোখের জল অত সস্তা নয়। চোখের জল ফেলার অনেক সুযোগ পাবি। দেখছিস্ না মানিকের মাকে? দেখছিস না হাবুর মাকে?

শর্মিলা সোজা হয়ে বসে জ্বলজ্বলে চোখে বলে—ওরা তো মা।

—একই কথা। মা, বউ সব সমান। তাদের কান্নার আসল সময় কখন আসে কেউ বলতে পারে না। তবে যদি ভাগ্য ভালো হয় পাশ কাটিয়ে যেতে পারিস। অপর্ণাকে দেখিস নি? কখনো জানতিস্ পুলিশ আসার

আগে ? ওর বাবা কী মার মারলেন ওকে। কাঁদলো ? ও জানে শিবুদের পেতে হলে শক্ত হতে হয়। ওরা তো আর চন্দ্রমিস্ত্রি না। ওরা পুরুষ মানুষ।

শর্মিলা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চন্দনার দিকে চেয়ে থাকে। তার চোখের জল শুকিয়ে যায়।

ক'দিন পরে বড়সাহেব হঠাৎ বদলি হয়ে গেল। রিজার্ভ ফোর্সে। মাত্র মাস পাঁচেক হলো এই ডিভিশানে এসেছিল—এর মধ্যেই বদলি। ইন্দ্রপাল ও সি-কে জিজ্ঞাসা করে—এটা কি হলো স্যার ? বড়সাহেবকে সান্টিং-এ ফেলে দেওয়া হলো কেন ?

—আমি কি করে বলব ? চাকরীতে বদলি আছে। মাস গেলে মাইনা পাওয়া নিয়ে কথা।

—না স্যার। জিনিসটা অত সরল বলে মনে হয় না। শুনলাম টেলি-ফোন ম্যাসেজ ধরিয়ে বদলি করা হয়েছে।

—জানি না। আমার কিছু ধারণা নেই।

ব্যারাকে সিপাইদের মধ্যেও আলোড়ন। বড়সাহেব সম্বন্ধে কল্পিত-অকল্পিত নানা ধরনের মুখরোচক আলোচনা শুরু হয়। কাকে কবে এক কেজি মাংস আনতে বলে বড়সাহেবের গৃহিণী পয়সা দেন নি। কবে কার ছেলের অসুখের সময় লীভ পিটিশান্ ও. সি. ফরোয়ার্ড করে দেওয়া সত্ত্বেও এই বড়সাহেব ছুটি দেয় নি। ছেলেটি মারা গিয়েছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি—

সুখরঞ্জন বলে, অমন কেঁচো খুঁড়তে গেলে অনেকের ব্যাপারেই সাপ বেরিয়ে পড়বে। শুধু এই বড়সাহেবকে দোষ দিয়ে লাভ কি ? কত ও. সি. আছে, এস-আই আছে, তারা কম যায় নাকি ? ও ঘরে আমাদের এ এস. আই. শীল জি ডি লিখছেন। তিনি কি মালা জপতে জপতে লিখছেন ? ওসব কথা ছেড়ে দে। দোষেগুণে সবকিছু।

কানাই বলে—উনি হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন বলে এত কথা উঠছে। কই এতদিন তো কেউ কিছু বলে নি।

দীপেন বলে—যদি কেউ কান ভাঙায়? সেই ভয় ছিল এতদিন।

আলম বলে—দ্যাখ অনেক ব্যাপারে অনেক গড়বড় আছে ঠিকই। তাই বলে অন্য সব ডিপার্টমেন্ট কি সাধু?

কানাই বলে—পুলিশে যারা ভালো থাকে তারাই আসল ভালো। সুযোগ আর ক্ষমতা পেয়েও সৎ থাকে। অন্য ডিপার্টমেন্টে সুযোগ আছে কিন্তু ক্ষমতা এতো নেই। নইলে সেখানেও কিছু লোক পঞ্চাশজন পুলিশের সমান পয়সা পেটে। ঈর্ষা—বুঝলি ঈর্ষা। ওরা ঠিকমত চান্স পেলে উপোষী ছারপোকার দশা হবে।

সেই সময় সুখদেও মধ্যাহ্নের আহার সেরে মাথা গরম করে চৌকা থেকে এসে বলে—মেস্-মানিজার বহুৎ রূপেয়া পিঠ্‌তেছে।

কথাটা শুনে ওদের আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। শুকদেও ভাত খায় সাড়ে তিনশো গ্রাম চালের। আর রাতে মেস-মেম্বারদের চাপের মুখে পড়ে খাওয়া কমিয়ে তেইশে এসে ঠেকেছে। ওর বরাবর মেস-ম্যানেজারের ওপর রাগ—সে যেই হোক না কেন। কিন্তু এবারে শিউপ্রসাদ মেস-ম্যানেজার নির্বাচিত হবার পর থেকে নিত্য দুবেলা বিস্ফোরণ ঘটছে শুকদেও-এর। ওর সঙ্গে অন্য মেম্বাররাও স্বীকার করে শিউপ্রসাদ আসার পর মেসের সত্যিই অবনতি হয়েছে। কিন্তু শুকদেও-এর আক্রমণ খুবই নগ্ন।

দীপেন বলে—শিউপ্রসাদ দেশে মন্দির বানাচ্ছে নাকি?

শুকদেও হাত উল্টে বলে—ক্যা মালুম।

আলম বলে—সোনার ডিম একবারে বার করে নিতে গেলে কি মন্দির তৈরী করা যায়? সে ছিল আমাদের আর্মড পুলিশের শচীনন্দন। আমাদের হিন্দু-মুসলিম মেস বলে আলাদা কিছু ছিল না। এখনো আমাদের সেই ব্যাটেলিয়ানে শুনেছি প্রতি কম্পানীতে একটা করেই

মেস্ আছে। সেখানে অনেক মেস্-ম্যানেজার বদলি হলো—কাউকে পছন্দ হয় না। গালাগাল দিতে দিতে ম্যানেজারদের বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। শেষে এলো **শচীনন্দন**। তার সময়ের খাওয়া-দাওয়ায় সবাই খুব সন্তুষ্ট। ফলে পাক্কা তিন বছর মেস-ম্যানেজারী করল। কোনো আজেবাজে ডিউটি করতে হলো না। পরে জানা গেল, বাগুইহাটিতে দুকাঠা জমি কিনে ফেলেছে।

সবাই হেসে ওঠে।

সেই সময়ে দারোগাপ্রসাদ সর্বাঙ্গে মাটি মেখে থানারই প্রাঙ্গণের কুস্তীর আখড়া থেকে ঘরে ঢোকে। তার কুস্তী লড়বার সময় অসময় নেই। দিনে একবার মাটি মেখে কুস্তোকুস্তি না করলে তার সারাদিন গা ম্যাজম্যাজ করে। রাতে ঘুম হয় না। এদের আলোচনা দেখে সে বলে—কী কোথা হচ্ছে?

দীপেন বলে—জমাদার সাহেব, মেসের খাবার খুব খারাপ হচ্ছে। সুখদেও-এর পেট তো ভরছেই না—আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে।

—আরে তা তো হোবেই। শিউপ্রসাদ মানিজর হয়ে জুয়া ধরেছে খবর রাখো?

সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। শুকদেও-এর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

দারোগাপ্রসাদ যেন বিরাট বোমা ফাটালো, তারপর হেঁড়ে গলায় 'সীয়া রাম' গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকলো।

একটা যুগ যেন পার হয়ে গেল। এর মধ্যে আলপনার সঙ্গে হারুর দেখা হয় নি। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। দুদিন আগে শর্মিলাকে একজোড়া স্কার্ট-ব্লাউজ কিনে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার নিজের প্যাণ্ট শার্ট আর নিয়ে নেয় নি। সব সময় পরে পরে শর্মিলা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ও দুটোর। নতুন প্যাণ্ট-শার্ট বানাতে হলে ঘনঘন ছিনতাই করতে হয়। শিবুর

মতে এই সময় সেটা ঠিক হবে না। যখন হাতে টাকা পয়সা একটাও থাকবে না, কিংবা কারও বাড়িতে আটা-চালের অভাব দেখা দেবে শুধু তখনই বেরোতে হবে। কিন্তু হারুর বাড়ির অবস্থা যে অতি শোচনীয় একথা শিবুরা বুঝেও বুঝতে চায় না। সে-ও সেকথা বলে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতে সঙ্কোচ বোধ করে। ফলে চুপচাপ থাকে।

আলপনা যদি তাকে মনে রাখে আবার দেখা হবে। সে অনেক উঁচুতে উঠতে চেয়েছিল বলে আলপনার সঙ্গে আলাপ করেছিল। কলকাতায় যার বাবার বাড়ি গাড়ি রয়েছে, যার বাবা রাজনীতি করে বেশ প্রতিষ্ঠিত তার মেয়েকে কতদিন গুলতাপ্পি মেরে বশে রাখা যাবে। একদিন ধরা পড়তেই হবে। কিন্তু আলপনাকে যে তার ভালো লাগে। ভুল হয়েছিল। আশেপাশের তাদেরই ঘরের মতো কোনো ঘরের মেয়েকে যদি ভালো লাগতো, তাহলে শিবুর মতো মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলে সুখ পেতো। মনটা ভরে উঠতো।

কর্পোরেশনের ইলেকশান এগিয়ে আসছে। তার চেয়েও বড় কথা লোকসভা আর বিধানসভার ইলেকশানের ঘোষণা যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে বলে কানাঘুষো চলছে। চারদিকে বিরাট তৎপরতা। বীরেনবাবুর ছোটাছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারে এই বস্তির এবং আশেপাশের আরও এলাকার ভার নেংড়া শেতল নেবে বলে কথা দেওয়ায় বীরেনবাবু নিশ্চিন্ত হয়েছে। শীতল চৌধুরী নিজেকে বলে প্রতিবন্ধী। সবাই কি জন্মগত প্রতিবন্ধী হয় ? বরং জন্মগত প্রতিবন্ধী একদিক দিয়ে ভালো। পরিপূর্ণ দৈহিক সুবিধার আস্বাদন তারা আগে কখনো পায় নি বলে অভাববোধটা বোঝে না। কিন্তু হঠাৎ যাদের হাত কিংবা পা কাটা পড়ে কিংবা অন্য কোনো অঙ্গহানি হয়, তারা হারানো অঙ্গের অভাব মর্মে মর্মে অনুভব করে ! শেতল ভাবে সেইসব দিনের কথা, যখন তার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারত না। পা দিয়ে শক্ত করে মাটি কামড়ে ধরে সে যেসব বোমা ছুঁড়তো সেগুলোর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। এখনও হাড়ের শক্তি আর নিশানা

এমন কিছু কমে নি, কিন্তু শক্তভাবে মাটির ওপর দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়েছে।

সামাজিক আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে প্রকৃতি থেমে থাকে না। তার কাজ সে করে যায়। ঋতু পরিবর্তনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে পরিবেশের মধ্যে। এলাকাটাকে এককালে কলকাতার সবুজ অবেষ্টনী বলা হতো। কলকাতার গাছপালা ঝাড়েবংশে নির্বংশ করার জন্য সরকারী আধাসরকারী পরশুরাম অনেক আগেই কুঠার হাতে আসরে নেমে পড়েছে। ফলে কলকাতা এখন রিক্ত-রুক্ষ নিষ্ফলা। কিন্তু তাকে ঘিরে সেই সবুজ-আবেষ্টনীর দিকে এখন পরশুরাম ধেয়ে আসছে নির্মম কুঠার হাতে। তবু মাচার ওপর শশার ফুল ফোটে। চালের ওপর চালকুমড়ো শুয়ে শুয়ে থাকে। দিগন্তবিস্মৃত মাঠে কিছুদিন পর থেকেই ফুলকপি বাঁধাকপি চাষের আয়োজন শুরু হবে। তবে কিছু-না-কিছু তরিতরকারী সব সময় এখানে ফলতে থাকে। কলকাতার যত ক্লেদ এখানে এনে ফেলা হয়। সেই ক্লেদ থেকে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে এরা ভূমিষ্ঠ হতে থাকে সারাবছর ধরে। পঙ্কে যেমন পঙ্কজ, এরাও তেমনি। এর আশে-পাশে যাদের বসবাস তারাও কি পঙ্কজ? অন্ততঃ ভোটের আগে আগে ভোটবাবুদের খাতির দেখলে তাই মনে হয়। তখন শিবু-হারুদের কাজে লাগে, শেতলকেও কাজে লাগে।

শীত আসতে বেশ কিছু দেরী। তাই কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, শীতের পদধ্বনি শোনার ভয়ে সেই আগুন অনেক নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। গাছের মাথাটা যখন লাল হয়ে থাকত তখন থেকেই শিবু-নিউটনরা বস্তী ছাড়া। মানিককে সেই যে পুলিশে ধরল, তারপর তাকে জেল হাজতে আটকে রাখা হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে নাকি সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ এ পর্যন্ত খাড়া করা যায় নি। বীরেনবাবুর কাছে শিবুদের একটি মাত্র শর্ত। কর্পোরেশনের ভোটের অগে মানিককে ছাড়িয়ে আনতে হবে। ভালো উকিল দিতে হবে। বীরেনবাবু ঢোঁক গিলে

নিমরাজী হয়েছে।

কৃষ্ণচূড়া গাছটি বোধহয় স্বয়ম্ভু। নির্জন মাঠের মধ্যে একা একা কবে জন্মেছে, কেউ বলতে পারে না। ধীরে ধীরে নিজের মতো বড় হয়েছে— রাস্তার ছেলেমেয়েরা যেমন হয়। তারপর একদিন অপর্ণা শর্মিলার মতো সবাইকে চমকে দেয়। আরক্তিম হয় গাছ ফুলে ফুলে। লোকের দৃষ্টি কাড়ে। যৌবন আসে।

অপর্ণার ওপর তার মা এবং বাবা সতীশ ড্রাইভারের কড়া নজর। পুলিশ এসে যখন তাদের মেয়ের সঙ্গে শিবুর ঘনিষ্ঠতার কথা জানালেন, তখন লজ্জায় তাদের মাথা কাটা গিয়েছিল। বস্তিতে বাস করেও তারা নিজেদের একটু আলাদা করে রেখেছিল। তাদের আশা একমাত্র মেয়েকে ভালোভাবে লেখাপড়া শেখাবে, গান শেখাবে। ভালো বিয়ে দেবে। সেই মেয়ে এই কেলেঙ্কারী করে বসলো। তারা মনে মনে চেয়েছে শিবুর মৃত্যু হোক ন্যাটা হাবুর মতো। কিন্তু মনে মনে চাইলেই হয় না। ওদিকে তাদের মেয়ে যে আবার আকুল প্রার্থনা জানায় শিবু দীর্ঘায়ু হোক। ওপরে কেউ যদি থাকেন, তিনি কার প্রার্থনা ফেলে কারটা রাখবেন?

অপর্ণার সঙ্গে মাত্র একদিন শিবুর দেখা হয়েছিল। তাও একান্তে নয়। তবু দেখা হয়ে ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল, কতদিন পরে দুজনার দেখা হলো। সেই সময় শিবু তাকে বলেছিল ক্ষেতের মধ্যের ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের কথা। বলেছিল ওখানে ও রোজ রাত একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অপর্ণা আসতে পারুক আর না পারুক! কারণ দুজনার অন্য ভাবে দেখা হবার সম্ভাবনা আর নেই। পুলিশ রীতিমত সক্রিয়। ভোটের ডামাডোলের বাজারে যদি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণচূড়ার গোড়ায় শিবু অপেক্ষা করবে শুনে অপর্ণা জানতে চেয়েছিল— কতদিন?

—রোজ। যতদিন স্বাধীন থাকব। যতদিন বেঁচে থাকব। যতদিন তুমি

না আসতে পারে।

অপর্ণা বলেছিল—আমি যাব। একদিন-না-একদিন।

খুব সংক্ষেপে ওরা কথার আদান-প্রদান করেছিল। করালী পিসির ঘরখানা এখনো ফাঁকা পড়ে থাকে। কিন্তু সেই ঘরের সুযোগ তারা নিতে পারে নি। পুলিশকে কে যেন বলে দিয়েছে ওই ঘরে তারা রাত কাটায়। এখন থানা থেকে রাউণ্ডে এলে ঘরখানার ভেতরে টর্চ ফেলে উঁকি দিয়ে যায়। নিউটনের ধারণা সতীশ ড্রাইভার এই অপকর্ম করেছে। শিবুর সেটা বিশ্বাস হয় না। বস্তির অন্য কেউ ওদের পেছনে লেগেছে। নইলে, মাঝে হারু একদিন আলপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেঁতো কাশীর দলের সামনে পড়ল কি করে? সেদিন বরাত-জোরে হারু বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকে আলপনার ওদিকে যাওয়া তার একেবারে বন্ধ। নিউটন, সুখেন মারা যাবার পর ব্রীজের নীচে যে দোকান থেকে বোমার মশলা সংগ্রহ করতে যায় সেখানকার খবর দেঁতো কাশীর দলকে দিলো কে? ওই দোকানদার ওদের জন্য বড়বাজার থেকে মশলা এনে রাখে। সে বলে দিয়েছে, তাকে দেঁতো কাশীর দল শাসিয়ে গিয়েছে বডি ফেলে দেবে বলে। সে আর এর মধ্যে নেই। বীরেনবাবুকে বলে তাই নতুন জায়গা থেকে আনার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। নিশ্চয় কেউ দেঁতোর দলকে খবর দিচ্ছে। আর তারা কখনো কখনো পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছে। লোকটা কে? শিবুরা বুঝি উঠতে পারে না। যে-ই হোক ধরা পড়লে তার নিষ্কৃতি নেই। হারু প্রশ্ন করেছিল—সতীশ ড্রাইভার হলে? শিবু কঠিন স্বরে বলেছিল—এখানে আপোষ নেই। সবাই সমান। পৃথিবী থেকে তাকে সরে যেতে হবে।

কদিন পরে বস্তির সবাই যেন ভূত দেখলো এক সন্ধ্যায়। মানিক ফিরে এলো গুটিগুটি। আল তাফই প্রথম দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কাছের পিকেটের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে ফেলে। ছোঁড়াটা পালিয়ে এলো নাকি জেল ভেঙে? কিন্তু আসলে তা নয়। বীরেনবাবু সরকার

পক্ষের কাকে ধরে কীভাবে যেন আপোষ করে ব্যাপারটা সম্ভব করে তুললো। দেঁতো কাশীর হত্যার মামলায় ফেঁসে গেলেও কোনোও প্রমাণ দাঁড় করানো যাচ্ছিল না, অথচ সে জামিনও পাচ্ছিল না। সেই জামিনটা সে পেয়ে গেল। বীরেনবাবুকে কাঠখড় পোড়াতে হলো যথেষ্ট।

আলতাফ ঢোঁক গিলে ফেললেও মানিক দিব্যি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক কাপ চা চাইল। আলতাফ ইশারা করতেও ভ্রূক্ষেপ নেই তার। আলতাফ বিরক্ত হয়ে মনে মনে 'মরুকগে যা' বলে এক গ্লাস চা তার হাতে ধরিয়ে দিলো।

মানিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু হেসে বলে—ওরা আমাকে ধরতে পারবে না। জামিনে খালাস।

—ও। আলতাফ নিশ্চিন্ত এবং বিস্মিতও বটে।

—শিবুদারা—

—কেউ নেই। লুকিয়ে-টুকিয়ে আসে।

সবাই দেখলো মানিক অনেক রোগা হয়েছে। তার মুখের কিশোর কিশোর ভাব অনেকটা অন্তর্হিত। বয়স তার কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে। আর গম্ভীর হয়েছে সে।

নিউটনের পিসি ছুটে গিয়ে মানিকের মাকে সুখবরটা দিলো। মানিকের মা প্রথমে চোখ বড় বড় করে চাইল। তার নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হতে লাগলো। তারপর সামনে মানিক এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

নিউটনের পিসি তাড়াতাড়ি বসে পড়ে মানিকের মায়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বলে—শিগ্‌গির এক ঘটি জল দে তো বাবা।

মানিক জল এগিয়ে দিয়ে একটা পাখা আনতে পাশের ঘরে ছুটলো। পেল পাখা।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল মায়ের। মা কাঁদতে লাগলো ক্ষীণ কণ্ঠে। নণ্টুর মৃত্যুর পর তো একা দিন কাটাতো। আর নণ্টুর কথাই তার

বেশী মনে পড়ে বড় ছেলেকে কাছে পেয়ে।

মানিক মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

ঘোত্‌নার মা এসে বলে—তুই কাঁদিস কেন বউ ? তোর নণ্টু তো বেঁচে রয়েছে। কজনের ছেলে অমন বাঁচে।

মানিক চমকে বলে, নণ্টু বেঁচে রয়েছে !

—নয় তো কি ? বাইরে গিয়ে দেখে আয়। তোর ভাই-এর নামে শহীদ বেদী হয়েছে। হাবু সুখেন আর নণ্টুর বেদী পাশাপাশি।

—সত্যি জেঠিমা। যাই দেখে আসি।

শর্মিলা একটু আগে খবর পেয়েছে মানিক এসেছে। তবু সে আসতে পারছিল না। সারা রাজ্যের লজ্জা তাকে ঘিরে ধরে। কেন এমন হলো বুঝতে পারে না। মানিক যেন অচেনা কোনো মানুষ। সে দাদার কিনে দেওয়া নতুন স্কার্ট-ব্লাউজ পরে এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় মানিকদের দরজার দিকে। দরজার কাছাকাছি যেতে দেখলো মানিক ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে। তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় মানিক। শর্মিলাও থেমে যায়। দুজনে দুজনার দিকে কিছুক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে। কেউ কথা বলে না।

ঘোত্‌নার মা সেই সময় বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের ওভাবে দেখে বলে —কি হলো রে মানিক ? ওকে চিনতে পারলি না। হারুর বোন শর্মিলা। বাবা, কদিন মাত্র জেলে ছিলি এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি ?

—ও।

শর্মিলা তখনো দাঁড়িয়ে। তার দেহ কাঁপতে থাকে। মানিক কোনোরকমে আবেগকে প্রশমিত করে বলে—শর্মিলা, নণ্টুর শহীদ বেদী কোথায়।

মৃদুস্বরে শর্মিলা বলে—বড় রাস্তার ওপরে।

—আমি দেখব। চল

শর্মিলা মানিকের পেছনে পেছনে চলে। ভাবে, এর মধ্যে মানুষটা কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। এখন আগের চেয়েও বেশী পুরুষ মানুষ বলে মনে

হচ্ছে। ওই মুখে আজ কি হাসি ফুটবে? সে কি কথা বলে হাসি ফোটাতে পারবে?

পরদিন মানিকের কাছ থেকে নিউটন জানলো, ভোটের আগে দু' পক্ষেরই কিছু কিছু লোককে ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে। আবার কিছু লোককে হাজতে নিয়ে যাবারও নাকি উদ্যোগ চলছে। কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে বলা মুশকিল। তবে মানিক দেখেছে, তার অপোজিট পার্টিরও কিছু ছেলে ছাড়া পেয়েছে। কোর্টের মধ্যেই শ্লোগান দিতে দিতে তারা বের হয়ে গেল। সরকার যাদের, কোর্ট তাদের। সারা রাজ্যই তাদের বাপের সম্পত্তি। ওদের মধ্যে একজন মানিককে চিনতে পেরে হেসে বলে—"চলি দোস্ত। রাস্তায় মোলাকাৎ হবে।" ছেলেটা চেনা চেনা লাগলো। বোধহয় দেঁতোর দলের।

শিবুর সঙ্গে মানিকের দেখা হলো না। সে নিউটনকে দিয়ে মানিককে সাবধান করে দিলো যে বস্তির কেউ, দেঁতো কাশীর দলকে খবর সাপ্লাই করে। খুব সাবধান।

শিবু বস্তিতে বড় একটা আসতে পারে না। এদিকে ওদিকে কাটায়। হারু আর নিউটন তোলা তোলে দোকানগুলো থেকে। শিবুর সঙ্গে ছোটখাটো অভিযানেও বের হয় তারা। পয়সার অভাব হয় না। কিন্তু শিবুর অসুবিধা হয়েছে প্রতি রাতে তাকে একটা থেকে তিনটে অবধি নিজেকে আলাদা করে রাখতে হয় বলে। সেই সময়টা তার কাটে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে। অপর্ণা এসে যদি ফিরে যায়।

একদিন রাতে ছিল ফুটফুটে চাঁদের আলো। সেদিন কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচ থেকে শিবু দেখলো কে যেন এগিয়ে আসছে। একটু পরেই বোঝা গেল সে একজন স্ত্রীলোক। অপর্ণার মতোই দেখতে। নিশ্চয় অপর্ণা। শিবুর ভেতরটা কী রকম করতে থাকে। কতদিন পর। এতদিনে অপর্ণা তার বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে।

হ্যাঁ, সত্যিই অপর্ণা। ওই রকম ভাবে পৃথিবীতে আর কেউ হাঁটে না।

একটু দ্রুত আসছে অপর্ণা। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে থেমে যায় সে। পেছন ফেরে। আরে সত্যিই তো। পেছনে একজন পুরুষ তাকে অনুসরণ করছে। ঠিক চেনা যাচ্ছে না। অপর্ণা লোকটার পায়ের শব্দ পেয়েছে নিশ্চয়। সে পেছনে তাকাতেই লোকটা ছুটে পালিয়ে যায় বস্তির দিকে। আর অপর্ণাও পেছন ফিরে ছুটতে থাকে। দেখলেই বোঝা যায় ভীষণ ভয় পেয়েছে সে।

শিবু রাগে অস্থির হয়ে ওঠে। তার জেদ চেপে যায়, লোকটার পরিচয় জানার জন্য। অপর্ণাকে কে অমন ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল। সে কি সতীশ ড্রাইভার? কিন্তু সতীশ ড্রাইভার অমন ছিপ্‌ছিপে্ নয়, অত জোরেও ছুটতে পারে না। তাছাড়া অপর্ণার বাবা হলে পালাতো না, ওখানেই মেয়ের চুল চেপে ধরে দু'ঘা বসিয়ে দিত।

শিবু বস্তির দিকে চলতে থাকে। সে খুব সাবধানে প্রথমে অপর্ণাদের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্থাৎ অপর্ণা নিরাপদে ফিরে এসেছে। তার মা বাবা নিদ্রিত। শিবু সারা বস্তিটা ঘুরে ঘুরে দেখে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বড্ড বেশী, একটা কুকুরকে লাথি মারতে সে আর্তনাদ করে সরে যায়।

অবশেষে নেংড়া শেতলের দরজায় দাঁড়ায়। শেতলদা ঘুমোচ্ছে বোধহয়। সে একবার শুধু একটু আস্তে ডাকতে শেতল উঠে এসে দরজা খুলে দেয়।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে শিবু বলে—তুমি রাতে ঘুমোও না?

—ঘুমোই একটু একটু। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। পায়ের ব্যথা বেড়েছে। কেন?

—তোমার পা যদি নেংড়া না হতো, আজ তোমাকে শেষ করে দিয়ে যেতাম।

—কেন রে? কি হয়েছে?

—এই বস্তিরই একজন আমাদের ফলো করে। সে নেংড়া নয়। সে ছুটতে পারে।

—ফলো করে কিনা জানি না, তবে খবর দেয়।

অপর্ণার কথা চেপে গিয়ে শিবু বলে—একটু আগেও আমাকে ফলো করছিল।

—এখন কটা বাজে ?

—পৌনে ছুটো।

—এত রাতে তোকে ফলো করছিল ? বলিস কি রে ? পুলিশ-টুলিশ নয় তো ?

—না।

—তুই তাহলে চলে যা। থাকিস না। আমি খবর নেবার চেষ্টা করব।

শিবু চলে যায়।

ন্যাটা হাবু খুন হবার পর থেকে তারা ঠিকভাবে কোনো কিছু করতে পারছে না। এজন্যে শিবুর মনে অস্বস্তি আর চাপ কম নয়। তার ওপর অপর্ণার সঙ্গে দেখা হয় না। যদিও বা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। শয়তানটার নিস্তার নেই। শিবু একবার কোমরের পিস্তলটাতে হাত বুলিয়ে নেয়। পথের কাঁটাকে সে সরিয়ে দেবে। শুধু একটা বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। সে যে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে অপেক্ষা করে এই খবরটা কারও জানা কিনা।

তাই পরদিন আবার সে গিয়ে দাঁড়ায়। কেউ আসে না। প্রতি রাতেই সে দাঁড়াতে শুরু করে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। তাহলে এমন হতে পারে যে কেউ সেদিন অপর্ণাকে বেরোতে দেখে ফেলেছিল হঠাৎ। কৌতূহলী হয়ে পেছনে পেছনে আসছিল। কিংবা কোনো বদ মতলব ছিল হয়তো।

দেঁতো কাশীদের পাড়া আর শিবুদের পাড়া ছু' জায়গাতেই পুলিশ পিকেট রয়েছে। ফলে কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারছিল না। নইলে

ভোটের দিন যেভাবে এগিয়ে আসছে, তাতে নানান্ ছুতোয় এতদিনে অনেক রক্তপাত ঘটে যেত। অনেক বারুদের গন্ধ বার হয়ে ধাপার গন্ধ চাপা দিয়ে দিত। ও পাড়ার দলের মধ্যে একটা আশা ছিল যে পুলিশ অন্তত তাদের কিছু বলবে না। সেই আশা এখন একটু ফিকে। শালার পুলিশদের কিছু বিশ্বাস নেই। কখন কোন্‌দিকে নল উঁচিয়ে ঝেড়ে দেয় কেউ বলতে পারে না।

মানিকের দিন ভালোই কাটছে। সে এখন শীতল চৌধুরীর ডেপুটি। সেখানে তার শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়। আর শীতল চৌধুরী কোনো কারণে যদি ওদের বসিয়ে রেখে বাইরে যায় দু'দণ্ড, তাহলে তো ভোকাট্টা। শর্মিলা ওঘরে যায় শেতলকে চা দেবার জন্যে। তখন মানিকও ভাগ পায়। মাঝে মাঝে শর্মিলা চায়ের সঙ্গে পাঁপর ভাজা নিয়ে আসে।

শেতল প্রশ্ন করে—এসব কোথায় পেলি রে?

শর্মিলা মুচকি হাসে। চন্দনার কথা বলতে মানা। শেতল কি আর বোঝে না? বুঝেও না-বোঝার ভান করে থাকে। তবে চন্দনা এতটুকু মেয়েকে দিয়ে এভাবে বার বার পাঠালে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়েকে অত ছোট ভাবা ঠিক না। আসলে শেতলের ধারণা নেই যে মেয়েরা কোনো এক বিশেষ ব্যাপারে বয়সের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পরস্পরের বান্ধবী হয়ে যায়।

অবশেষে শিবুর প্রতীক্ষার অবসান। অপর্ণা সত্যিই এলো এবং এসেই শিবুর বুকের ওপর ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ ওই ভাবেই তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একে শুনতে থাকে অপরের বুকের ধুকধুকানি। অনুভব করল আরও কতো কি। তারপর শিবু আস্তে আস্তে অপর্ণাকে ধরে তাকে গাছের নীচে তারই একেবারে পাশে বসায়।

চাঁদ দেরিতে উঠবে আজ।

অনেক পরে দু'জনে যখন একটু ধাতস্থ হলো, তখন শিবু প্রশ্ন করায়

অপর্ণা বলল, আর এক রাতের কথা। সেদিন সে-ই আসছিল। হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। পেছন ফিরতেই দেখতে পেল একজন ছুটে গেল।

—কে সে ? কে ?

অপর্ণা বলে—ঠিক চিনতে পারলাম না। তবে মনে হলো যেন—

—কে ? কী মনে হলো ?

—না। ঠিক দেখিনি যখন, তখন শুধু শুধু—

—কার মতো দেখতে।

অনেক ইতস্তত করে অপর্ণা বলে—মনে হলো যেন চন্দ্রমিস্ত্রি। কিন্তু তা কেন হবে ? কিন্তু লোকটা খুব ভালোমানুষ।

শিবু সোজা হয়ে বসে বলে—সব সম্ভব। আমাকে বলে ভালো করেছ। মানিক ওর ওপর নজর রাখবে।

অপর্ণার চোখ টল্‌টল্ করে। তারপর দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সে বলে —তুমি কবে বাড়ি ফিরবে ?

শিবু ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে—ফিরবো অপর্ণা। এই তো কর্পোরেশনের ভোট এসে গেল। এর পরই শুনছি বড় ভোট হবে। এখন আমাদের কেউ বড় একটা ঘাঁটাবে না। তাতে দু'পক্ষেরই ক্ষতি।

—তুমি বস্তিতে থাকলে মনে হয় আমার কাছেই আছো।

—আমারও কি কম কষ্ট অপর্ণা ?

—তুমি রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকো ?

—হ্যাঁ, অপর্ণা।

—ইস্, কী কষ্ট তোমার।

—কোনো কষ্ট হয় না আমার।

—জান আমি যাকে খুশী বিয়ে করতে পারি। আমার বয়স রীতিমত উনিশ।

—আগে পারতে না বুঝি ? শিবু হেসে বলে।

—হ্যাঁ। পারতাম। কিন্তু জানতাম না যে আঠারো বছর হলে নিজে বিয়ে করা যায়। যাবে ?

শিবু একটু অবাক হয়ে বলে—কোথায় ?

—রেজিস্ট্রি অফিসে ?

শিবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। তার সামনে ভেসে ওঠে তর-তাজা ন্যাটা-হাবুর নিশ্চল রক্তাক্ত দেহ। তারও তো ওসব হতে পারে। তখন কে দেখবে অপর্ণাকে ? সতীশ ড্রাইভার তাড়িয়ে দেবে।

অপর্ণা অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে—উত্তর দিলে না ?

—কী !

—বিয়ে করবে না আমাকে ?

—তুমি ছাড়া আর কাকে করব ? কে আছে আমার অপর্ণা ?

সেই সময় গাছের পেছনে খস্‌খস্‌ শব্দ। শিবু চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করার সঙ্গে সঙ্গে, পেছনের লোকটা সামনে এসে গুলি করে। অপর্ণা আর্তনাদ করে এলিয়ে পড়ে।

শিবুর গুলিও একই শব্দে ছোটে। সে জানে তার লক্ষ্য অব্যর্থ। লোকটি পড়ে যায়। সেই সময়ে সে আর একজনকে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাতে দেখে। কিন্তু শিবুর গতি অনেক বেশী। সে লোকটির কাছাকাছি গিয়ে পা দিয়ে তাকে ফেলে দেয়। লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে প্রথমে, তারপর উল্টে চিৎ হয়ে হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চায়। চন্দ্রমিস্ত্রি। শিবু চন্দ্রমিস্ত্রির পেটের ওপর ডান পা চাপিয়ে দেয়। তারপর সামনে ঝুঁকে তার বুকের বাঁদিকে পরপর দুটো গুলি করে।

তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসে অপর্ণার কাছে। খুব করুণ ভাবে অপর্ণা কাতরাচ্ছিল।

—কোথায় লেগেছে অপর্ণা ?

—জানি না।

শিবু বসে পড়ে পাশে। দেখে অপর্ণার বুকে কোনো রক্ত নেই। অন্ধকারে

ভালো দেখতে পায় না। চাঁদ সবে উঠেছে। সে হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝতে পারে বাঁ হাতের ওপর দিকে কোথাও লেগেছে। সে অপর্ণাকে কাঁধের ওপর তুলে নেয়। তারপর এগোতে থাকে। পেছনে কিছুটা দূরত্বে পড়ে রইল দুটি প্রাণহীন দেহ।

শেতলের দরজায় গিয়ে একবার ডাকতেই ভেতর থেকে শোনা যায়—

কে? শিবু?

হ্যাঁ। খোলো।

শেতল চৌধুরী দরজা খুলে একটু চেয়ে থেকে, তাড়াতাড়ি ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে লাইট জ্বালায়।

দেখা গেল অপর্ণার বাঁ হাত ঘেঁষে গুলি বার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রক্তপাত হচ্ছে প্রচুর। ভয়ে এবং রক্তপাতে অপর্ণা অবসন্ন।

—আব্বাসকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন তো শিবু।

শিবু বেরিয়ে যায়। একটু পরে আব্বাস এসে ঘরে ঢোকে। সে দাওয়াই লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে বলে—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

শেতল বলে—ঠিক আছে। শিবু তুই চলে যা।

—একটু পরে যাচ্ছি।

আব্বাস চলে গেলে শিবু শেতলকে বলে—দেঁতোর দলের লালু আর চন্দ্রমিস্ত্রি পড়ে আছে কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে।

—গুলির শব্দ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পুলিশ। চন্দ্রমিস্ত্রি তাহলে সেই লোক।

—হ্যাঁ।

তুই চলে যা। আমি দেখি কি করতে পারি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে অপর্ণাকে। দেখি—চিন্তা করিস না।

শিবু চলে যায়। অপর্ণা রক্ত দিয়ে শিবুর জীবনের সঙ্গে তার জীবনটা পাকাপাকি ভাবে বেঁধে নিল। কিন্তু শিবুর ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চয়তায় ভরা। সেই পথেই শিবু আবার পা বাড়ালো। তবু এদের জীবনেও আছে

প্রেম ভালবাসা। ভাই বোনের প্রতি স্নেহ। মা বাবার প্রতি টান। কিন্তু এদের ভেতরের ভালোগুলো ভালভাবে বেড়ে ওঠার অবকাশ পায় না। তাই এদিকে নেংড়া শেতল, ন্যাটা-হাবু আর শিবুর দল এবং ওদিকে দেঁতো কাশী মুখপোড়া আর লালুরা। এদের রাজনীতি জ্ঞান নেই ততটা, তত্ত্বও বোঝে না। এদের কেউ কেউ অন্ধ বিশ্বাসে চলে, কেউ অভাবের তাড়নায় যে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়ে। কখনো বা কিছু আপাত কারণও থাকে। তবে এতে একবিন্দু ভুল নেই যে এদের ভাঙিয়ে বীরেন-বাবুর দল ফয়দা ওঠায়। এদের রক্ত এ অঞ্চলের স্লটার-হাউসের জীব-জন্তুর রক্তের চেয়েও সস্তা। সেই সস্তা রক্তের বিনিময়ে দেশপ্রেমিকরা ক্ষমতায় এসে সুললিত বাণী শোনায় দেশবাসীকে। এদের জন্য পুলিশকে ব্যস্ত থাকতে হয় অহরহ। এদের উৎপাতে অনেক খেতে-পাওয়া শান্ত-শিষ্ট নাগরিক উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করে। অনেক সময় তবু এদের মুছেও ফেলা যায় না পরিবর্তনও আনা যাবে না। মানুষ বাড়ছে, অভাব বাড়ছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ নেই, শিক্ষা নেই খাদ্য নেই। তাই এরাও বাড়ছে আর বাড়ছে বীরেন বটব্যালের দল।

—০—